কালেমার হাকিকত

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

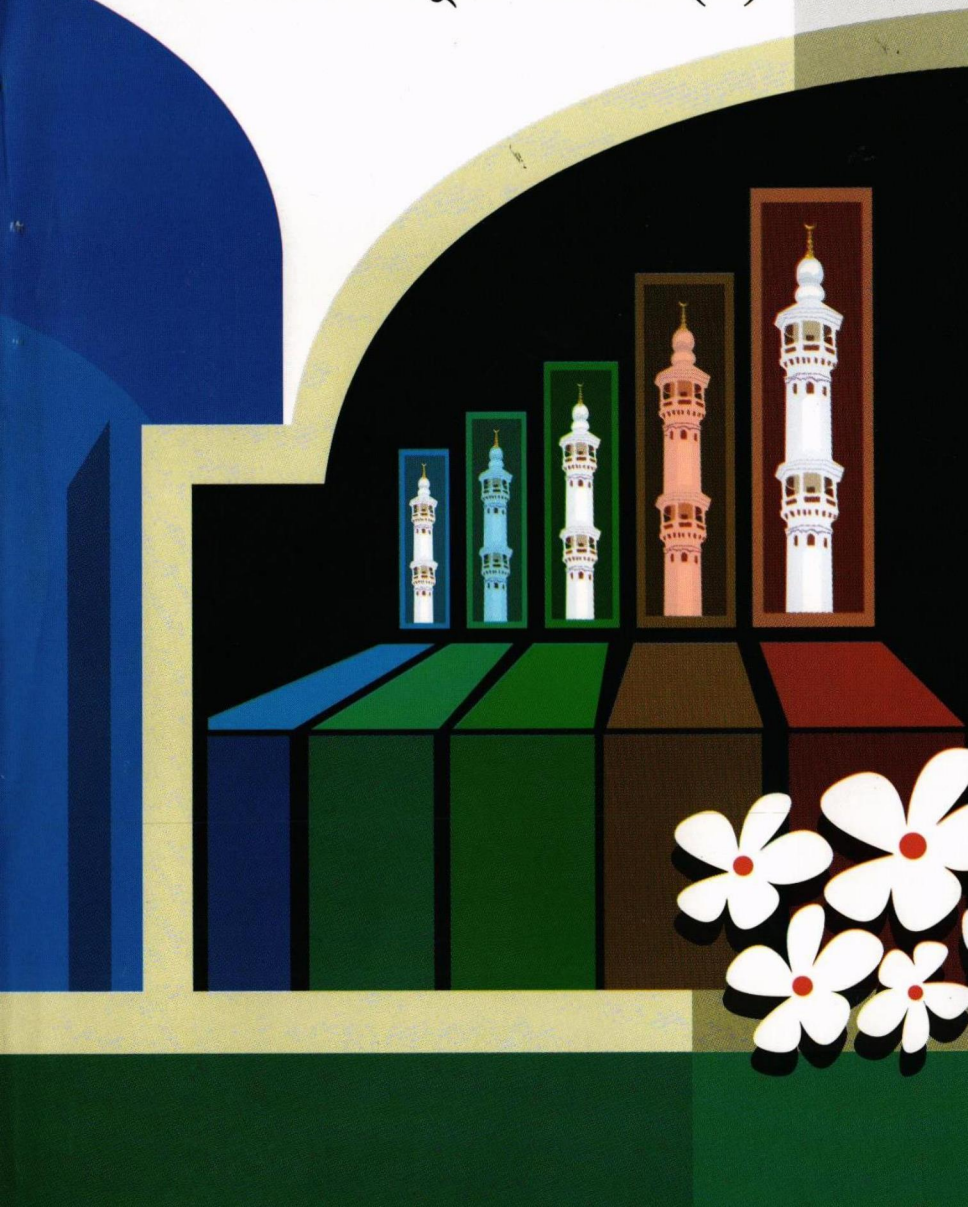

কালেমার হাকীকত

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

কালেমার হাকীকত
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮৭ ইং
ত্রিশতম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৫ ইং

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার

মূল্য : ৬০ টাকা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৫
কালেমা তাইয়্যেবা	৭
কালেমা প্রচারের পূর্বেকার আক্বীদা	৭
কালেমার দু'টি অংশ	৯
মানুষ ও কালেমার আদি কথা	১০
নবী (স) যখন কালেমার দাওয়াত দেন তখনকার আরবের সামাজিক অবস্থা	১২
আল্লাহর নবী কেন এসব পথ ধরলেন না	১৫
যে পথে তিনি অগ্রসর হলেন	১৬
কালেমা পড়ার অর্থই হলো আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা	১৮
কালেমা ব্যাপক অর্থবোধক	১৯
কুরআনী আন্দোলন ও কালেমার দাওয়াত	২০
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য	২৪
কালেমা চায় দেশে ইসলামী আইন	২৭
কালেমা শাহাদাত	
কালেমা শাহাদাতের বিপ্লবী ঘোষণা	৩০
এর নাম সাক্ষ্যবাণী হলো কেন	৩১
আজান ইকামতে কেন কালেমা শাহাদাত	৩২
সাক্ষ্য মানল কে?	৩৪
কার নিকট সাক্ষ্য দিব?	৩৪
কেন সাক্ষ্য দিব?	৩৫
কি সাক্ষ্য দেব এবং কিসের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেব	৪১
আত্তাহিয়াতুর মধ্যে কালেমা কেন	৪১
ইসলামী জীবন জিন্দেগীতে এ কালেমার গুরুত্ব কতটুকু	৪১
ঈমানের তাৎপর্য	
আমাদের ঈমান ও হুজুরে পাক (স) এর সঙ্গী সাথীদের ঈমানের মধ্যে পার্থক্য	৪৩
ঈমানের ৩টি অবস্থা	৪৪
বিশ্বাসের লক্ষণ	৪৫
১নং কালেমা ঈমানে মুফাচ্ছাল	৪৬
কিতাব ও নবী রাসূলের কথার মর্যাদা	৪৯
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার মর্যাদা	৫১
২নং ঈমানে মুজমাল	৫৩
আল্লাহর গুণবাচক নামকে কিভাবে গ্রহণ করতে হবে	৫৬
আল্লাহর নাম অর্থ ও ব্যাখ্যা	৫৭
'কাবিলতু' শব্দের তাৎপর্য	৭০
ঈমানের বৈশিষ্ট্য	৭২
কাদের ঈমানের দাবী সত্য	৭৪
পরিশিষ্ট	৭৭

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

পবিত্র মাহে রামাদান উপলক্ষে প্রখ্যাত মুফাসসির ও গবেষক মাওঃ খন্দকার আবুল খায়ের যশোরী (যুক্তিবাদী) সাহেব রচিত 'কালেমার হাকীকত' বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর অশেষ শোকরিয়া আদায় করছি। লেখকের ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'কালেমা তাইয়্যেবার বিপ্লবী দাওয়াত' কালেমা শাহাদাতের বিপ্লবী ঘোষণা'ও 'ঈমানের তাৎপর্য' বই তিনখানা পাঠক সমাজে অকল্পনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বইগুলোর উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধিই এর প্রমাণ। আমাদের অনুরোধে লেখক বইয়ের মূল্য কমানোর মহান লক্ষ্যে তিনটি বই একই প্রচ্ছদ ও ইনারে 'কালেমার হাকীকত' শিরোনামে পুনরায় প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন, সাথে সাথে ব্যাপক সংশোধন ও পরিবর্ধন করে বইয়ের মান বৃদ্ধি করেছেন। ইনশাআল্লাহ লেখকের খালেছ তৌহিদবোধের সহজ সরল উপস্থাপনা ও এর অন্তর্নিহিত জাদুকরী প্রভাব পাঠককে এক নিঃশ্বাসে বইটি পড়ে ফেলতে প্রলুব্ধ করবে। জাতিধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি আদম সন্তানের চিন্তা ও চেতনায় বিপ্লবের সুত্রপাত হলে আমাদের এ নগণ্য শ্রম সার্থক হবে।

বইয়ের মান বৃদ্ধিকল্পে পাঠক পাঠিকাদের যে কোন পরামর্শ আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করবো।

বিনীত

প্রকাশক

১/৫/৮৭ ইং

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমরা যেভাবে কালেমা পড়ি আর সাপুড়েরা যেভাবে সাপের মন্ত্র পড়ে এই দুই পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে যুক্তিতে ধরা পড়ে না। সাপুড়েদের যেমন সাপের মন্ত্রের কোন অর্থ জানার দরকার হয় না শুধু মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করলেই বিষ নেমে যায়, আমাদের যেন তেমনই কালেমার অর্থ জানার কোন দরকার হয় না। আমরা মনে করি, বিষ নামানো মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করলে যেমন সাপের বিষ নামতে বাধ্য ঠিক তেমনই কালেমা পড়লে দোজখের আগুণ নিভে যেতে বাধ্য। আসলে এটা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মনে রাখবেন, আরবী একটা ভাষা। এ ভাষায় কথা বলে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের এক বিরাট বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের অধিবাসী। এই ভাষাতেই তৈরী ইসলামের কালেমাগুলো। সে কালেমার শব্দগুলো কোন অর্থহীন শব্দসমষ্টি নয়। তা অর্থবোধক শব্দ দ্বারা গঠিত। আর সে অর্থগুলোও এমন তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রভাব বিস্তারকারী যে– তার প্রভাব মানুষের মন মগজকে প্রভাবান্বিত করবেই। সে অর্থের প্রভাব মানুষের চিন্তা রাজ্যে সৃষ্টি করে এক বিপ্লব আর জীবন ধারাকে প্রবাহিত করে এক নতুন ধারায় এক নতুন পথে। কিন্তু সে প্রভাব কোন শব্দে সৃষ্টি হয় না, হয় অর্থে। যেমন কোন বাংলাভাষীকে যদি আরবীতে খবর দেয়া হয় যে ماتت امك (মাতাত্ উম্মুকা) তবে তার মধ্যে কোনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না, কিন্তু যদি ঐ খবরটাকেই বাংলায় বলা হয় যে, 'তোমার মা মারা গেছেন' তাহলে সে যে অস্থির হয়ে কান্না শুরু করবে তা কোন শব্দের কারণে নয়, তা বোধগম্য অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে পাওয়া খবরের কারণে। তাহলে এর থেকে বুঝা গেল অর্থ না বুঝে মা মরা সংবাদ শুনলে যেমন সে মায়ের সন্তানের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না তেমন অর্থ না বুঝে কালেমা পড়লেও সে কালেমা পড়া মুসলমানের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না। মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকার জন্য কালেমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন যে কত প্রয়োজন তা অর্থ না জানলে

www.pathagar.com

কিছুতেই বুঝে আসতে পারে না এবং সে অর্থ হালকাভাবে জানলেও চলবেনা, জানতে হবে স্পষ্টভাবে ও পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে। আমি এই উদ্দেশ্যে কালেমা তাইয়্যেবা, কালেমা শাহাদাত, ঈমানে মুফাস্‌সাল ও ঈমানে মুজমালের মূল তাৎপর্য সমাজের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ মেহেরবাণী করে কবুল করবেন এবং এর মাধ্যমে মেহেরবান আল্লাহ পাক আমার ও হাজার হাজার বনি আদমের নাজাতের একটা ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ আমার নেক উদ্দেশ্য পূরণ করুন। আমীন।

ইতি–
গ্রন্থকার

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কালেমা তাইয়্যেবা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সার্বভৌমত্বের মালিক নয়, হযরত মোহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল।

কালেমা প্রচারের পূর্বেকার আক্বীদা

রাসূল (স) যখন কালেমা প্রচার শুরু করলেন তখন তিনি দেখলেন তৎকালিন মানুষের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কীয় কিছু আক্বীদা বিশ্বাস রয়েছে। তিনি দেখলেন হযরত মূসা (আঃ) এর যারা উম্মত বলে দাবী করত সে ইহুদীরা বিশ্বাস করতো যে আল্লাহ তাদের জন্যই বেহেশত তৈরী করেছেন, আর দোযখ তৈরী করেছেন ইহুদীদের যারা শত্রু তাদের জন্য। তারা মনে করে, যেহেতু তাদের বংশে বহু নবী রাসূল সৃষ্টি হয়েছেন তাই বেহেশ্‌ত তাদের বংশের লোকদের জন্য আল্লাহ খাস করে সৃষ্টি করেছেন। পরকালে তাদের ভয়ের কোন কারণই নেই তারা কর্মফল সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে কর্মফল পরকালে নয়, পৃথিবীতে।

পরকালে তাদের জন্য ভয়ের কোন কারণ নেই এই বিশ্বাসই তাদেরকে বেপরোয়া করে গড়ে তোলল। আর পরকালের ভয় দূর হয়ে গেলে তারা হয়ে পড়ে শক্ত জালেম। কাজেই তারা জালেমও হয়ে পড়ল স্বাভাবিক নিয়মেই। আর এ জন্যই তাদের উপর নেমে এলো আল্লাহর গজব।

খৃষ্টানরা বিশ্বাস করত, যারাই হযরত ঈসা (আ) কে আল্লাহর ছেলে ও শেষ রাসূল হিসাবে মেনে নেবে তাদের জন্য পরকালে আর কোন ভয় নেই। কারণ– তাদের বিশ্বাস যে হযরত ঈসা (আ) নিজে শূলে বিদ্ধ হয়ে তাঁর সমস্ত উম্মতের গোনাহের শাস্তি নিজেই ভোগ করেছেন। কাজেই তাঁর উম্মতের আর কোন ভয় থাকার কথা নয়। এই বিশ্বাস তাদেরকেও নির্ভীক করে গড়ে তুলল। আর তাদের ২য় বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের জীবনের দু'টি অংশ (১) দ্বীনদারী বা ধর্মীয় অংশ আর (২) দুনিয়াদারী অংশ। তাদের এ বিশ্বাস এখনও রয়েছে যে 'মানুষ দুই মহা প্রভুর অধীন, যথা (১) ধর্মীয় প্রধান ও (২) রাষ্ট্রীয় প্রধান। রাষ্ট্র প্রধান শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা

www.pathagar.com

বলবেন, তিনি ধর্ম ব্যবস্থার ওপরে কোন কথা বলতে পারবেন না। আর যিনি ধর্ম প্রধান তিনি ধর্মীয় ব্যাপারেই কথা বলতে পারবেন তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন না। এই আকীদার কারণে তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হলো ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা।

তারা মনে করে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলার জন্যে এটাই উত্তম পথ এবং এ পথেই সমাজে শান্তি কায়েম হতে পারে। তাদের বিশ্বাস যে, রাষ্ট্রের কোন আইন কানুনের ক্ষেত্রে ধর্মপ্রধান যদি বাধার সৃষ্টি করে তা যদি রাষ্ট্রপ্রধান মেনে নিতে না পারে তাহ'লে রাষ্ট্রপ্রধান ও ধর্ম প্রধানের মধ্যে সৃষ্টি হবে দ্বন্দ্ব। আর সে দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়বে গোটা জাতির মধ্যে, ফলে শান্তি ব্যহত হবে চরমভাবে। কাজেই তারা তাদের আকীদা বিশ্বাস মুতাবিক জীবনের দুই অংশের জন্যে দুই মহা প্রভু ঠিক করে নিয়েছে এবং তাদের কাজের বা অধিকারের একটা সীমানা ভাগ করে দিয়েছে সে সীমানা তাদের কোন প্রভুই অতিক্রম করতে পারবে না।

কিন্তু ইসলাম এই দুই জাতির কোন ধারণার সঙ্গেই একমত নয়। না ইহুদীদের সঙ্গে আর না খৃষ্টানদের সঙ্গে। মুসলমানদের ধারণা কর্মের জন্য এ দুনিয়া আর কর্মফল পরকালে। মুসলমানদের বিশ্বাস একজনের পাপের শাস্তি অপরে ভোগ করবে না। প্রভু আমাদের একাধিক নয়, তিনি একাই একমাত্র প্রভু। এই কথারই জোরাল স্বীকারোক্তি হচ্ছে কালেমা তাইয়্যেবায়। মুসলমানদের বিশ্বাস যে, মানুষ যদি দুই প্রভুকে প্রভু হিসাবে মেনে নেয় তাহলে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে দুই প্রভুর নির্দেশ যদি দুই প্রকার হয়ে যায় তাহলে একই সঙ্গে দুই প্রকার নির্দেশ মেনে চলা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমন এক প্রভু যদি বলেন রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলতে আর অন্য প্রভু যদি বলেন রাস্তার বাম পাশ দিয়ে চলতে তাহলে চলব কোন পাশ দিয়ে? যে পাশ দিয়েই চলি না কেন তাতে এক প্রভুর নির্দেশ অমান্য করা হবেই। এজন্যে মুসলমান কখনও দুই প্রভু মানে না। এইটারই স্বীকার উক্তি রয়েছে কালেমা তাইয়্যেবার মধ্যে। তাছাড়া যুক্তি হচ্ছে এই যে একই চাকর যেমন দুই মুনিবের চাকুরী একই সঙ্গে করতে পারে না এবং একজন স্ত্রী যেমন একই সঙ্গে দুইজন স্বামীর স্ত্রী হতে পারে না– কারণ এখানে আনুগত্যের প্রশ্ন রয়েছে। ঠিক তেমনই কোন মানুষ একই সঙ্গে দুই মহা প্রভুর বান্দা হতে পারে না। এই কথাগুলোই অত্যন্ত সহজ ভাষায় আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় মাত্র ২৪টি অক্ষরের তৈরী ৭টি শব্দ দ্বারা গঠিত

www.pathagar.com

কালেমা তাইয়্যেবার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। কালেমাটি আকারে ছোট হলেও এর ভাবার্থ ও শিক্ষা মোটেই ছোট নয়। এর মধ্যে অর্থাৎ ২৪ অক্ষরের বা ৭ শব্দের কালেমার মধ্যে শিক্ষা রয়েছে কম পক্ষে ২৪×৭=১৬৮টি। এ কালেমার মধ্যে ইলাহ নামে যে শব্দটি রয়েছে এই শব্দটি আল্ কুরআনে ১৪৭টি আয়াতের মধ্যে এসেছে। আল্লাহ এ শব্দটিকে সঠিক ভাবে বুঝানোর জন্যেই এতগুলো আয়াতের মধ্যে ইলাহ্ শব্দ এনেছেন। যে সব আয়াতের মধ্যে ইলাহ শব্দ এসেছে সে আয়াতগুলোর আয়াত নম্বর সূরা ও পারা এ পুস্তিকার শেষাংশে দেয়া হলো। আয়াতগুলো সহজেই কুরআন থেকে দেখে নেয়া যাবে।

কালেমার দু'টি অংশ

এ কালেমার দু'টি অংশ। একাংশে বলা হয়েছে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এই অংশে অন্যের নয়, শুধু মাত্র আল্লাহরই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয় এবং অপর অংশে বলা হয়েছে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এই অংশে স্বীকার করা হয় যে হযরত মুহাম্মদই (স) তাঁর পাঠানো Appointed Authority। যেসব ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন সে সব ক্ষেত্রে অন্যের কিছুই বলার অধিকার নেই। যেমন কোর্টের হাকীম– যাকে সরকার বিচারক হিসাবে নিয়োগ করছেন– একমাত্র তারই অধিকার রয়েছে কোন মামলার বিচার করার আর কারও সে অধিকার নেই ঠিক তেমনই রাসূলকে আল্লাহ পাক যেহেতু হাকিম নিযুক্ত করেছেন কাজেই কোন ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলই ফায়সালা দিতে পারেন, অন্যরা নয়। আপনি যদি কোন আসামীর জামীনের জন্যে কোর্টের কোন হাকীমের নিকট দরখাস্ত পেশ করেন তাহলে সেই দরখাস্তে জামিন মঞ্জুরের ক্ষমতা যেমন হাকিম বা সরকারের নিয়োজিত Authority ভিন্ন অন্য কারও নেই ঠিক তেমনই মানুষের জীবন যাপন কোন নিয়মে চলবে, মানুষের কোন অপরাধের কি শাস্তি হবে ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যবস্থা প্রনয়ণকারী ও হাকিম হিসাবে যিনি আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন, একমাত্র তিনিই দিতে পারেন জীবন ব্যবস্থা, অন্যেরা নয়। এইটারই স্বীকারোক্তি রয়েছে এ কালেমার শেষাংশে। এখন মানুষ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর কাউকে সার্বভৌম

www.pathagar.com

ক্ষমতার মালিক বলে মানে তা'হলে যেমন আল্লাহর উলুহিয়াতে (প্রভুত্বে) শরিক করা হয় তেমন কেউ যদি জীবন ব্যবস্থা রচয়িতা হিসাবে কাউকে মানে তা সে মাওসেতুং হোক কার্ল মার্কস্ হোক বা x y z যেই হোক না, অন্য কাউকে জীবন-ব্যবস্থার রচয়িতা হিসাবে মানলেই রাসূলের রেসালাতিতে তাদেরকে শরীক করা হয়। আমরা যেমন সহজ ভাবেই বুঝি যে কোর্টের হাকীম যে জামীন মঞ্জুল করবেন না সেই জামীন অন্য কেউ ম ুর করতে পারে না আর পারলেও পারবে তখন, যখন কোন বিদ্রোহীদল প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে নিতে পারবে তখনই সেই বিদ্রোহী দলের নিয়োজিত কোন নেতা হাজতের আসামীদের জামীন দেয়ার বা ছেড়ে দেয়ার অধিকার পায় অন্যথায় কেউ তা পারে না। ঠিক তেমনই আল্লাহর সঙ্গে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে শুধু তারাই পারে রেসালাতে অন্য কাউকে শরীক করতে। এ সবকিছুই বুঝবার জন্য প্রয়োজন মনকে নিরপেক্ষ করে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করা। আমরা এসব বিষয় চিন্তা ভাবনা করলে অবশ্যই অন্য যে কোন মতবাদের সমর্থক হতে পারি না এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানতেও রাজি হতে পারি না।

মানুষ ও কালেমার আদি কথা

«اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً» "পৃথিবীতে আমি আমার খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠাব" মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা ঘোষণা করলেন। অন্যান্য কোন প্রাণীকে আল্লাহ যেহেতু খলিফা করেননি তাই তাদেরকে সে ধরনের উপযুক্ত করেও সৃষ্টি করেননি। মানুষকে যেহেতু খলিফা করে সৃষ্টি করেছেন তাই খেলাফতির দায়িত্ব পালনের যাবতীয় যোগ্যতাও মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে দিয়েছেন (১) জ্ঞানবুদ্ধি (২) বাকশক্তি (৩) শ্রবণ শক্তি (৪) দর্শন শক্তি (৫) উদ্ভাবনী শক্তি (৬) কর্মক্ষমতা ও (৭) ব্যক্তি স্বাধীনতা। আর দিয়েছেন (১) দয়া-মায়া, (২) ভালোবাসা, (৩) সততা, (৪) পরোপকারিতা, (৫) ধৈর্য (৬) কৃতজ্ঞতা ও (৭) ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদির ন্যায় কিছু গুণ যা প্রয়োজন হয় খেলাফতির দায়িত্ব পালনের জন্যে। অতঃপর সে দায়িত্ব পালনে যেন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির সৃষ্টি না হয় সেজন্য আল্লাহ কতকগুলো বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা করেছেন। যেমন–

www.pathagar.com

১। জন্মের পূর্বেই মানুষের নিকট থেকে আল্লাহ 'রবের' স্বীকৃতি নিয়েছেন। সব মানুষের রুহ সৃষ্টি করে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন "আলাসতু বি রাব্বিকুম" আমি কি তোমাদের প্রভু নই? "কালূ বালা" উত্তরে সব রুহ

বলেছিল ঃ হাঁ- আপনি আমাদের প্রভু। এই রব শব্দটা আল কুরআনে ১৭৮ বার এসেছে।

২। জন্মের পর যখন তাকে খেলাফতির দায়িত্বভার দেয়া হলো তখন তার কাছ থেকে নেয়া হলো ইলাহার স্বীকৃতি। কাউকে রাষ্ট্রের কোনো উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হলে যেমন তাকে শপথ পড়তে হয়, তেমন খলিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হলেও তাকে শপথ পড়তে হয়। সেই শপথই হচ্ছে কালেমা তাইয়্যেবা। এ শপথের অর্থ হলো এই যেমন আমি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ বা মুনিব বলে মানব না, আল্লাহর হুকুম মত চলব নবীর নির্দেশে। এ কথা বললে তার ওপর দায়িত্ব এসে যায় আল্লাহর উলুহিয়াতকে নিজের বাস্তব জীবনে মেনে নেয়া এবং তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রকৃতপক্ষে কালেমা তাইয়্যেবার মাধ্যমে সেই অঙ্গীকারই করা হয় যে অন্যের নয়, শুধু আল্লাহরই প্রভুত্ব ও তাঁরই নিরংকুশ মালিকানা আমি নিজে মেনে নিচ্ছি এবং এই মানার ভিত্তিতেই সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ব। এর প্রমাণ পাই আমরা নবী-জীবন ও সাহাবীদের জীবন থেকে। তাঁরা কালেমা পড়ে যা স্বীকার করেছিলেন তারই ভিত্তিতে তাঁরা সমাজ গড়েছিলেন এবং সে কাজটাকে তাঁরা অপরিহার্য কর্তব্য ও দায়িত্ব বলে মেনে নিয়েছিলেন। এ কালেমা পড়ার পর আমাদের ওপরও সেই দায়িত্ব এসে যায় যে দায়িত্ব এসেছিল (১) নবী করীম (স) (২) তাঁর সঙ্গী সাথী, (৩) তাবেয়ীন, (৪) তাবেতাবেয়ীন, (৫) আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন, (৬) মুজাদ্দেদীন ও (৭) সলফে সালেহীনদের ওপর।

৩। সে দায়িত্ব শিক্ষা দেয়ার জন্যে প্রয়োজন ছিল একজন আদর্শ শিক্ষক- তিনি হচ্ছেন নবী (সঃ)।

৪। এ কাজ কিভাবে ও কোন আইনের ভিত্তিতে করতে হবে তার জন্যেই একখানা আইন গ্রন্থ দেয়ার প্রয়োজন ছিল সেই গ্রন্থই হচ্ছে আল-কুরআন।

www.pathagar.com

৫। আর দায়িত্ব পালন করলো কিনা তার জন্যে প্রয়োজন ছিল হিসাব নেয়া, এর জন্যেই রয়েছে পরকাল।

৬। আর প্রয়োজন দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া- তার জন্যে রয়েছে দোজখ এবং

৭। যারা দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে তাদের পুরস্কৃত করা- এর জন্যে রয়েছে বেহেশত।

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল ঃ

১। মানুষকে আল্লাহর খলিফা বলে ঘোষণা করা,

(২) "আলাসতু বিরাব্বিকুম, কালূ বালা।" এর মাধ্যমে তার রবুবিয়াতের স্বীকৃতি নেয়া,

(৩) "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর মাধ্যমে তাঁর উলূহিয়াতের স্বীকৃতি আদায় করা।

(৪) কিতাব সহ নবী প্রেরণ (৫) ইসলামী আন্দোলন ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর খেলাফত কায়েম (৬) পরকালের হিসাব-নিকাশ ও (৭) বেহেশত-দোজখ-এর প্রত্যেকটি ব্যাপারই একটির সঙ্গে অপরটি সম্পর্কযুক্ত। এ কোন বিছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত ব্যাপার নয়।

এবার দেখা যাক আল্লাহ পাক যে নবীকে আমাদের জন্যে অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য করে পাঠালেন তিনি এই কালেমাকে সমাজের সম্মুখে কিভাবে তুলে ধরেছিলেন এবং তার ফলাফল-ই বা কি হয়েছিল।

নবী (স) যখন কালেমার দাওয়াত দেন তখনকার আরবের সামাজিক অবস্থা

১। তখন আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল এমন যে, যাযাবর সুলভ কিছু গুণ ছাড়া সৎগুণের কিছুই তাদের মধ্যে ছিল না। যথা ঃ-

(ক) নিজের মেয়েকে জ্যান্ত কবর দেয়া,

(খ) লোকহত্যা করা,

(গ) চুরি-ডাকাতি,

(ঘ) রাহাজানি,

www.pathagar.com

(ঙ) মদ-মাতলামি,

(চ) জুয়া ও

(ছ) ব্যাভিচার।

বরং এ কাজগুলোকে তারা আভিজাত্যের লক্ষণ হিসাবে মনে করতো। তখনকার আরবের অবস্থাকে বুঝাবার জন্যে একজন আরব কবির নিম্নোক্ত ছন্দগুলোকে আমরা স্মরণ করতে পারি। কবি জুহাইর বিন আবু সালমা বলেছেন ঃ

অস্ত্র বলে নিজেকে যে না পারিবে বাঁচিতে
ধ্বংস তার অনিবার্য পারবেনা সে বাঁচাতে।
আগ বেড়ে যে অত্যাচার না পারিবে করিতে
মজলূম তাকে হতেই হবে, এ আরব ভূমিতে।

তৎকালীন আরবের অবস্থার পূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে এ ছন্দের মধ্যে কাজেই সে যুগকে বলা হয় আইয়্যামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ।

২। তখন আরবে গোত্রবাদ জারি ছিল, তারা বুঝাতো নিজের লোকের সাহায্য করা, তা সে জালেম হলেও। আর বুঝতো অন্য গোত্রের কাউকে কোন প্রকার সাহায্য না করা- তা সে মজলুম বা অত্যাচারিত হলেও।

৩। ন্যায় বিচারের নাম গন্ধও তখন ছিল না।

৪। অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল তখন পুরোমাত্রায়। একদিকে কেউ ছিল পথের ভিখারী; অন্যদিকে সুদী কারবার, মুনাফাখোরী, মজুতদারী, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, লুটতরাজ ইত্যাদি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে কেউ গড়তে ছিল আকাশ ছোঁয়া অর্থের পাহাড়।

৫। আর ছিল দাসপ্রথা -পশুর ন্যায় মানুষ কেনাবেচা হতো

৬। তখন গোত্রে গোত্রে চলছিল দলাদলি, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ইত্যাদি পশুসুলভ আচরণ।

৭।তখন আরবের পার্শ্ববর্তী শস্য শ্যামল ফসলে ভরা এলাকাগুলো ছিল অনারবদের হাতে অর্থাৎ উত্তরে সিরিয়া ছিল রোমানদের পরোক্ষ শাসনের অধীন আর দক্ষিণে ইয়েমেন ছিল পার্শিয়ানদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে। আরবদের হাতে ছিল একমাত্র হেজাজ, নেজদ ও কয়েকটা মরুদ্যান এবং ঘাস পাতা বিহীন কিছুটা মরুভুমি।

www.pathagar.com

মোটামুটি এটাই ছিল তৎকালীন আরবের সামাজিক অবস্থা। এই অবস্থায় আল্লাহর নবীর সামনে ৩টি সহজ পথ খোলা ছিল, যে পথে অগ্রসর হলে সহজেই অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে ও বিনা বিরোধিতায় তিনি রাজক্ষমতা দখল করতে পারতেন। অতঃপর তিনি নির্বিঘ্নে তৌহিদের প্রচার করতে ও কালেমার দাওয়াত দিতে পারতেন। সে পথ তিনটি ছিল -যথাক্রমে,

১। আরব জাতীয়তাবাদের নামে আন্দোলন করে আরবদেরকে একত্রিত করা। এতে আরবের লোক সবাই তাঁর কথা শুনতো, কারণ তিনি একদিকে ছিলেন উচ্চ বংশের সন্তান অপর দিকে ছিলেন প্রত্যেকের নিকট বিশ্বাসী। আরবের লোক মুহাম্মদ (স)-কে ভাল জানতো, মানতো এবং সালিসী মীমাংশায়ও ডাকতো যেমন, হাজরে আসওয়াদ নিয়ে আরবে যে বিবাদ চলছিল তা মুহাম্মদ (স)-ই নিস্পত্তি করে দিয়েছিলেন এবং আরবের প্রত্যেকটি গোত্রপতিই তা মেনে নিয়েছিল। অতএব, আরব জাতীয়তাবাদের নামে অগ্রসর হলে তিনি যে কন্টকমুক্ত পথেই রাজশক্তি হাতে পেতেন এতে কোনই সন্দেহ ছিল না।

২। অর্থনৈতিক বিপ্লব বা অর্থনৈতিক সাম্যের দাবী তুলতে পারতেন। এতে আরবের সমস্ত ন্যায়বাদী লোকদের তিনি সমর্থন পেতেন। এ পথেও তিনি রাজশক্তি হাতে পেতেন অতি সহজেই।

৩। চরিত্র সংশোধন ও চরিত্র গঠনের দাবীও তুলতে পারতেন। এতে আরবের সমস্ত ন্যায়বাদী লোকদের তিনি সমর্থন পেতেন।

এর যে কোন পথে আল্লাহর নবী পা বাড়ালে তিনি আরব বন্ধু জাতির পিতা , বহু কিছু উপাধিও পেতেন এবং নির্বিঘ্নে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তৌহিদ ও কালেমার প্রচার করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ সে পথে পা বাড়াতে দেননি নবী (স)-কে। আল্লাহ তাঁর নবীর উপর হুকুম জারি করলেন, তুমি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অতঃপর এই কালেমার মাধ্যমে লোকদেরকে একত্রিত কর। আর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে এই কালেমার দাবীর ভিত্তিতে উৎখাত করে সেখানে ইসলামী সমাজ গড়ে তোল, যেন সমাজের প্রতিটি কাজই আল্লাহর ইবাদতে পরিণত হয়। আল্লাহ এতটুকু বলেই ক্ষ্যান্ত হননি বরং তিনি তাঁর রাসূলকে আরও হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, খবরদার! এই কালেমার দাবীর ওপর বহাল থাকতে ও এর দাবী মুতাবিক সমাজ গড়তে যত বিপদই আসুক না কেন তা সহ্য করবে এবং সাহসিকতার সাথে তার মুকাবিলা করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

www.pathagar.com

আল্লাহর নবী কেন এসব পথ ধরলেন না

১। তিনি যদি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আন্দোলন শুরু করতেন তাহলে আরবজাতিকে সংঘবদ্ধ করতে পারতেন ঠিকই কিন্তু

(ক) সার্বজনীন ইসলাম আরবের সীমানা অতিক্রম করে তা বাইরে বেরুতে পারতো না।

(খ) সে রাষ্ট্র হতে পূর্বের অন্যায়-অপকর্মগুলো দূর হতো না।

(গ) ভিন্ন ভাষাভাষীদের অত্যন্ত সৎ লোককেও শত্রু মনে করতে হতো।

(ঘ) স্বদেশীর কোন অপরাধকে অপরাধ বলা যেতো না।

(ঙ) ন্যায় বিচারের নাম গন্ধও থাকতো না।

(চ) নিজের লোক জালেম হলেও সাহায্য করতে হতো।

(ছ) অন্যে মজলুম হলেও তাকে সাহায্য করা যেতো না।

(জ) স্বজনপ্রীতি বাড়তো।

২। অর্থনৈতিক সাম্যের দাবীতে গুটি কয়েক ধনীদের হত্যা করে হয়তো একটা সর্বহারাদের রাষ্ট্র কায়েম করতে পারতেন কিন্তু

(ক) সে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় চরিত্রবান লোক পাওয়া যেতো না।

(খ) খোলাফায়ে রাশেদীনের কাউকে হয়তো গুপ্ত হত্যার শিকার হতে হতো।

(গ) ধনসম্পদ যা বহুলোকের হাতে ছড়িয়ে ছিল তা জড় হতো রাষ্ট্র পরিচালকদের হাতে।

(ঘ) রাষ্ট্রের নাগরিকগণ হতো রাষ্ট্রযন্ত্র। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার আদৌ কোনো ক্ষমতা কারও থাকতো না। মানুষ হতো কলের পুতুল।

(ঙ) স্বদেশে বাস করতে হতো জেলখানার কয়েদীর ন্যায়।

(চ) সরকারী রাজনৈতিক দল ছাড়া আর কোনও রাজনৈতিক দল থাকতে পারতো না।

(ছ) তৌহিদের প্রচার তখন কোন মতেই সম্ভব হতো না। এতে মানুষ

www.pathagar.com

মুসলমান হতো না; হতো নাস্তিক। যা বর্তমান বিশ্বের ঘটনাপুঞ্জি থেকে বুঝা যায়।

৩। চরিত্র সংশোধনের আন্দোলন তিনি করতে পারতেন কিন্তু এই জন্য করেননি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো করেই জানতেন যে চরিত্রের মূল ভিত্তিই হচ্ছে 'ঈমান'। যদি কারও মনে ঈমান বা বিশ্বাস না থাকে যে পরকাল বলে কিছু একটা আছে এবং এ জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপও দেখার মত কোন অদৃশ্য শক্তি রয়েছে যিনি আমাদের প্রতিটি কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করছেন- যার ভিত্তিতে পরকালে বিচার হবে ও অপরাধী সাব্যস্ত হলে শাস্তি পেতে হবে- তবে তাকে কোন প্রকারেই সর্বদিক দিয়ে চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলা যাবে না।

৪। আমরা দেখেছি জাতীয়তাবাদের নামেও ইমেজ সৃষ্টি করা যেতো, লোক সংঘবদ্ধ করা যেতো, রাষ্ট্রও গড়া যেতো কিন্তু সে পথে মানুষকে-

(ক) তৌহিদবাদী করা যেতো না।

(খ) অর্থনৈতিক সাম্য সে পথে কস্মিনকালেও সম্ভব ছিলনা।

(গ) চরিত্র গঠনের জন্যে সেটা আদতেই কোন যুক্তিগ্রাহ পথ ছিলনা।

(ঘ) এ পথে স্বজনপ্রীতি এড়ান যেতো না।

(ঙ) গুরুত্বপূর্ণ পদে সৎলোকের পরিবর্তে নিজের লোক দিতে হতো।

(চ) নিজের লোকদেরকে অন্যায় করা থেকে ফিরান যেতো না।

(ছ) ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে গুন্ডা বাহিনী পুষতে হতো।

তা হলে দেখা যাচ্ছে উপরোল্লিখিত যে কোন পথই মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় ডাকার জন্যে কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা ছিল না। বরং প্রমাণ হলো যে খোদার প্রতি বিশ্বাস- তাঁর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের প্রতি বিশ্বাস ও প্রতিফল গ্রহণের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে কোনো প্রকারেই তাকে সৎ পথে আনা যায় না।

যে পথে তিনি অগ্রসর হলেন

আল্লাহ ভালোই জানতেন যে কোন্ পথে মানুষকে দ্বীনের রাস্তায় আনা যাবে ও দ্বীনের ওপরে টিকিয়ে রাখা যাবে। এসব বিষয়ে যিনি পূর্ণ জ্ঞাত তিনি তাঁর নবীকে এক বিশেষ পথে অগ্রসর হতে বললেন। সে পথটা হলো ঐ বিপ্লবী ও

www.pathagar.com

বিদ্রোহী কালেমার দাওয়াত। মাত্র ২৪টি অক্ষরের তৈরী ও ৭টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত এ কালেমাটি এমনই এক ব্যাপক অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ কালেমা যে, বহু ৭ -এর জবাব, বহু ৭ -এর সামাধান ও বহু ৭ -এর আনাগোনা রয়েছে এ ৭-শব্দের কালেমার ব্যাখ্যার মধ্যে। আরও রয়েছে এর মধ্যে পৃথিবীর হাজারও সমস্যার সামাধান। এ কালেমার যাত্রা শুরু হলো মানবমনের এক সর্বাত্মক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাবের মাধ্যমে। তা হলো প্রভুত্ব কার? মানুষের না আল্লাহর? এবং দাসত্ব কার? মানুষের না আল্লাহর? এটা ছিল এমনই এক প্রশ্ন যার সঙ্গে (১) ভাষা (২) জন্মসূত্র (৩) ধর্ম (৪) গোত্র (৫) বর্ণ (৬) দেশ ও (৭) কাল, এর কোনটারই কোন সম্পর্ক ছিল না; এর সম্পর্ক হচ্ছে মানবতার সঙ্গে। এ বিষয়টি এমনই এক দর্শন যার পরিবর্তন সূচিত হবে না কোন যুগেও বরং এ প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানুষের (১) মান (২) মর্যাদা (৩) ইজ্জত (৪) সম্ভ্রম (৫) অর্থনৈতিক মুক্তি (৬) মানবীয় অধিকার— এমনকি (৭) মানবীয় সত্তাসহ টিকা না টিকার প্রশ্ন। এই একই কালেমার মধ্যে রয়েছে (১) খেলাফতির দায়িত্ব পালনের জন্যে শপথবাণী (২) দ্বীনের রাস্তায় ডাকার জন্যে দাওয়াত বা আহবান বাণী, (৩) ইসলামী সামাজ বিপ্লবের ডাক, (৪) বিশ্বভ্রাতৃত্ব, (৫) অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিমূল, (৬) মানুষের প্রভুত্ব খতম করে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রতিজ্ঞা ও (৭) পরকালের জবাবদিহির ভিত্তিতে আল্লাহর খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার অঙ্গীকার। এসব দাবীর ভিত্তিতে সমাজে ইসলামী আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্যে এ কালেমা ছিল এক বিপ্লবী দাওয়াত। তাই আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে এই কালেমার দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিলেন।

নির্দেশ পেয়ে আল্লাহর নবী আরবের লোকদেরকে এক বিশেষ নিয়মে ডেকে একত্রিত করে ঘোষণা করলেনঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ আল্লাহ ছাড়া কেউ প্রভু নেই, হযরত মোহাম্মদ (স) তাঁর রাসূল। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, "কালেমা তাইয়েবাকে এমন এক পবিত্র গাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যার মূল শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং যার বহু শাখা-প্রশাখা শূন্যে বিস্তার লাভ করে রয়েছে। অর্থাৎ কালেমার মূল বিশ্বাসটা মূল শিকড়ের ন্যায় মানুষের মগজে শিকড় গেড়ে থাকবে। তার জীবনের প্রতিটি শাখা প্রশাখা হবে কালেমা বিশ্বাস মুতাবিক। জীবনের শাখা প্রশাখা বলতে বুঝায় মানুষের (১) ব্যক্তিগত জীবন যাপন (২) পারিবারিক আচরণবিধি (৩) সামাজিক বন্ধন (৪) রাষ্ট্রীয় বিধি বিধান (৫) অর্থনৈতিক আইন কানুন (৬) বৈষয়িক

www.pathagar.com

বিষয়াদি (৭) আন্তর্জাতিক নীতি নির্দ্ধারণ ইত্যাদি বিষয়াদি। এগুলিকে ৭ কথার কালেমার ৭টি প্রধান শাখা বলা চলে। আর প্রশাখা বলতে আমরা বুঝতে পারি যে, জীবনযাপনের খুঁটিনাটি দিক যা প্রধান শাখা থেকেই বহির্গত হয়েছে, যেমন (১) পারস্পরিক সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, (২) ব্যবসাবাণিজ্য, (৩) চাকুরী-বাকুরী, (৪) আয়-ব্যয়, লেন-দেন, সঞ্চয়, (৫) শিক্ষা-দীক্ষা, (৬) শিল্পকলা (৭) চাষাবাদ ইত্যাদি আরও সাতটি। অর্থাৎ আল্লাহ বুঝালেন যে কালেমা পড়া লোকদের যাবতীয় কাজেই হতে হবে কালেমার বিশ্বাস মুতাবিক।

কালেমা পড়ার অর্থই হলো আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।

প্রকৃতপক্ষে এ কালেমা হচ্ছে অল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ ঘোষণা। মানুষ হয়ে মানুষের ওপর প্রভুত্ব করা আল্লাহর বিধানে নেই।

এই জন্যেই সূরা নাসের মধ্যে বলা হয়েছে এক আল্লাহই 'রাববুন্নাস', বা সব মানুষের প্রভু 'মালিকিন্নাস' বা সব মানুষের রাজা। 'ইলাহিন্নাস' বা সব মানুষের ওপর সার্বভৌমত্বের মালিক। এমন অনেক কিছুই আছে যা মুশরিকানা ধর্মে আছে কিন্তু ইসলামে তা নেই। যেমন অন্য ধর্মে পূজা অর্চনা আছে কিন্তু ইসলামে তা নেই। ঠিক তেমনি অন্য ধর্মে মানুষের ওপর মানুষ রাজা বাদশাহ আছে কিন্তু ইসলামে তা নেই। ইসলাম বলে সব মানুষের একই প্রভু আল্লাহ এবং সব মানুষ একই প্রভুর বান্দা বা গোলাম। মানুষ যদি মানুষের ওপর প্রভু হয়ে চেপে বসে তা হলে মানুষ প্রভুর হুকুমই মানুষ প্রজাদের মেনে চলতে হয়। আর এতে সব চাইতে বড় অসুবিধা হয় ঐখানে যেখানে মানুষ প্রভুর হুকুম আর আল্লাহর হুকুম দুই প্রকার হয় সেখানে আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়েই মানুষ প্রভুর হুকুম মেনে চলতে হয়। ফলে মানুষ প্রভুর দাপটে আলাহ প্রভুর হুকুম বাতিল হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ প্রভুর হুকুম হলো চোরের হাত কেটে দাও আর মানুষ প্রভুর হুকুম হলো চোরকে জেলে দাও। ফলে আল্লাহর হুকুম বাতিল হলো আর মানুষ প্রভুর হুকুম কায়েম হলো। এভাবে যারাই আল্লাহর বিধানকে বাতিল করে নিজেদের বিধান জারি করে তারাই আল্লাহদ্রোহী, আর তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই হচ্ছে কালেমা তাইয়েবার মূল ভাবার্থ। এ কারণেই হযরত ইব্রাহিম (আ)

www.pathagar.com

কালেমা পড়লে নমরূদ বুঝেছিল যে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হচ্ছে। ঠিক ঐ একই বুঝ বুঝেছিল মূসা (আ) এর কালেমা পড়া থেকে ফেরাউন এবং রাসূলুল্লাহ (স) এর কালেমা পড়া থেকে আবু জেহেল ও আবু লাহাবের গোষ্ঠি। ফলে রাষ্ট্রদ্রোহীদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতিগণ যে ব্যবহার করে সেই ব্যবহারই পেয়েছেন প্রত্যেক নবী-রাসূলগণ তাদের সমকালীন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট হতে। এ কালেমার আসল ভাবার্থ হলো মানি না মানি না কারো আইন মানি না, আল্লাহ ছাড়া কারো আইন মানি না। আর এ কথা বললেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সৎ সাহস যাদের নেই তাদের জন্যে মুসলমান হওয়া সাজে না। কাজেই রাসূলের সাহাবী যাঁরাই কালেমা পড়েছিলেন তারা প্রত্যেকেই হয়েছিলেন আল্লাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য যোদ্ধা। আল্লাহর আইন আল্লাহর জমিনে কায়েম করার জন্যে তারা জান দিয়েছেন কিন্তু মানব রচিত আইন তারা মেনে নেন নি। এটাই হয় কালেমা পড়া মুসলমানদের চরিত্র।

কালেমা ব্যাপক অর্থবোধক

এই ধরণের ব্যাপক অর্থবোধক বিপ্লবী কালেমার দাওয়াত পৌছার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হলো এক বিরাট আন্দোলন। গড়ে উঠলো আন্দোলন। হাটে, মাঠে, ঘাটে ও কর্তাব্যক্তিদের মাহফিলে সর্বত্রই ঐ একই কথা—একই আলোচনা, একই জল্পনা কল্পনা—যে দাওয়াত উঠেছে, প্রভুত্ব মানুষের নয়; প্রভুত্ব খোদার। গুঞ্জন শুরু হল কায়েমী স্বার্থবাদী মহলে ----- এবার মোদের উপায়? উপায় আর কিছু না, পথ সামনে ২টি। এর যে কোন একটির পথ ধরতেই হবে (১) হয় কালেমা পড়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। (২) নইলে কালেমার দাওয়াতকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থবাদীরা পারলো না মনকে মানাতে। দুনিয়ার স্বার্থ ত্যাগ করে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করতে পারলো না তারা। কাজেই তারা মরণ পণ চেষ্টা করলো দ্বীনের দাওয়াতকে মিটিয়ে দেয়ার জন্যে। জুলুম অত্যাচার শুরু হলো কালেমার দাবীদারদের ওপর। কালেমা পড়াদের মধ্যেও গুঞ্জন শুরু হলো। তাহলে এখন কি করি? কথা বললে যে মার খেতে হয়? আল্লাহ হুকুম দিলেন "হয় মার অথবা মর" (আল-কুরআন) কিন্তু

www.pathagar.com

কালেমার দাওয়াত বন্ধ করো না। খোদার হুকুম "যতক্ষণ তারা আল্লাহর এবং নবীর নিষিদ্ধ কাজকে ত্যাগ না করে এবং আল্লাহর দ্বীনকে কবুল না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আর যদি কেউ তোমাদের অধীন হয়ে থাকতে চায় এবং জিযিয়া কর স্বহস্তে দিতে স্বীকার করে তবে তাদের সঙ্গে আর যুদ্ধ করো না" (আল-কুরআন) অতঃপর মুসলমানরাও বুঝলো যে আমাদেরও সামনে পথ দু'টি। হয় (১) আল্লাহদ্রোহিদেরকে ময়দান ছেড়ে দিয়ে জাহান্নামের পথ ধরতে হবে অথবা (২) জীবনমরণ যুদ্ধ করে আল্লাহর দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অতঃপর কালেমা পড়া মুসলমানগণ ১নং এর সহজ পথ বাদ দিয়ে ২নং এর কঠিন পথে পা বাড়ালেন। শুরু হলো দুই পক্ষের তুমুল সংঘর্ষ। মুসলমানরা (১) মার খেলেন, (২) দেশত্যাগী হলেন, (৩) যুদ্ধ করলেন, (৪) ঘর বাড়ী হারালেন, (৫) আত্মীয়-স্বজন হারালেন, (৬) সমাজ থেকে বহিস্কৃত হয়ে নির্বাসিত জীবন যাপন করলেন এবং (৭) না খেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে হাড় হয়ে গেলেন কিন্তু শত্রুকে ময়দান ছেড়ে দিলেন না। আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করতেই হবে নইলে আল্লাহ খুশি হবেন না, বেহেশত পাওয়া যাবে না, তাই তাঁরা এতো দুঃখকষ্ট মাথা পেতে নিলেন। এবার আসুন স্পষ্ট করে বুঝে দেখি যে, আন্দোলন কেন ও কিসের।

কুরআনী আন্দোলন ও কালেমার দাওয়াত

গভীর মনোযোগ সহকারে আল কুরআন অধ্যয়ন করলে চিন্তাশীল জ্ঞানী গুণীদের জ্ঞানে এইটাই ধরা পড়বে যে, ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে গোটা সমাজে পূর্ণাঙ্গভাবে কায়েম করে দেয়া এবং যতদিন তা কায়েম না হয় ততদিন পর্যন্ত এমন আন্দোলন পরিচালনা করা, যার মাধ্যমে তা কায়েম হতে পারে তার পুরা ব্যবস্থা রয়েছে প্রথম ১৩ বছরে নাযিল হওয়া ৮৯টি মাক্কী সূরার মধ্যে আর ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র চলবে যে নিয়ম নীতির ভিত্তিতে অর্থাৎ গোটা মানব সমাজের সামগ্রিক কার্যকালাপ ইবাদতে পরিণত হবে যে সব আইন মেনে চললে তার পুরা আইন কানুন নাযিল হয়েছে পরবর্তী ১০ বছরে নাযিল হওয়া ২৫টি মাদানী সুরার মধ্যে। যেহেতু আন্দোলন ও জিহাদ ছাড়া সমাজে কোন পরিবর্তন আসে না তাই মানুষের তৈরি আইন—যে আইনে সমাজে মানুষের প্রভুত্ব ও শিরক কায়েম ছিল তা পরিবর্তন করে আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে আন্দোলন ও জিহাদ ছিল অপরিহার্য। কারণ কালেমা পড়া মুসলমানগণ যখন দেখবে যে সমাজ চলছে কালেমা বিশ্বাসের বিপরীত পথে অর্থাৎ শিরকের পথে অথচ মুসলমানদের দাবী তার বিপরীত তখন মুসলমানদের ওপর দায়িত্ব এসে যায়—তারা কালেমার মাধ্যমে যা স্বীকার করে তা যে কোন মূল্যেই হোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এ করতে হলে পর্যায়ক্রমে যে কাজ করতে হয় তা হচ্ছে (১) আন্দোলন (২) শ্লোগান (৩) মিছিল (৪) জিহাদ। কারণ, যে কোন দাবী ২/১ জন করলে তাকে দাবীই বলে। কিন্তু বহুলোক কোন দাবী করলে ঐটারই নাম হয় আন্দোলন। ২/১ জনে কোন কথা বললে তাকে 'কথাই' বলে। কিন্তু একই কথা একই সঙ্গে বহু লোকে বললে তারই নাম হয় শ্লোগান। ২/১ জনে পথ চললে তাকে পথ চলাই বলে কিন্তু বহু লোক একই উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে পথ চললে ঐটার নাম হয় মিছিল । আর একই মালিকানা দুই পক্ষ দাবী করলে তাদের মধ্যে যে চরম সংঘর্ষ হয় ঐটারই নাম জিহাদ। তাহলে এই বিচারে দেখা যাচ্ছে আন্দোলন, শ্লোগান, মিছিল ও জিহাদ আর কারো জন্যে না হলেও মুসলমানদের জন্যে একান্তই অপরিহার্য। কারণ এ পথ ছাড়া আল্লাহর প্রভুত্বও কায়েম হয় না এবং তা না করতে পারলে শিরকের হাত থেকেও বাঁচা যায় না। আর তা না বাঁচতে পারলে বেহেশতেরও কোন আশা করা যায় না। আর যেহেতু কালেমা পড়া প্রত্যেকের একই বিশ্বাস, একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য, কাজেই তাদের দাবীও হতে হবে এক, তাদের সবাইকে মিলে বলতে হবে একই কথা। তাদের সবাইকে চলতে হবে একই সঙ্গে ও একই উদ্দেশ্যে। আর যে ইলাহা বা প্রভুত্ব নিয়ে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে বিপরীতমুখী দাবী তা মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করাই হচ্ছে কালেমা পড়াদের একমাত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব। তাহলে এর থেকে প্রমাণ হলো যে, কালেমার বিশ্বাসই তার অনুসারীদেরকে বাধ্য করে বিপ্লবী আন্দোলন করতে ও জিহাদ চালাতে, কিন্তু প্রশ্ন, বর্তমান যুগে কালেমার যা ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে তার সঙ্গে আমার কথার কোন মিল পাওয়া যাচ্ছে না কেনো? এর জবাবে আমি কয়েকটি জানা কথা বলছি যার প্রতি লক্ষ্য করলে এবং তা আমার ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অবশ্যই বুঝবেন যে, আমি কোন নতুন কথা বলছি না। যেমন লক্ষ্য করুন ঃ

(১) প্রথম ওহি নাযিল হওয়ার পরে অরাকা বিন নওফেলকে ঘটনাটি বললে তিনি বলেছিলেন "তুমি যখন এ কালেমার প্রচার শুরু করবে তখন সারা দেশের লোক ভীষণভাবে তোমার বিরোধিতা শুরু করবে।"

www.pathagar.com

(২) রাসূল (স) তায়েফে গিয়ে এতো মার খেয়েছিলেন যে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন।

(৩) তিনি অনেকগুলি যুদ্ধ করেছিলেন।

(৪) তিনি শিবে আবু তালিব পাহাড়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন যে সময়ে আরবের লোকেরা রাসূল (স) কে ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে ভাতে পানিতে মারার পরিকল্পনা করেছিল। অতঃপর গাছের ফল, গাছের ছাল ও উটের শুকনো চামড়া খেয়েও জীবন ধারণ করতে হয়েছিল রাসূলে পাক (স) ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে।

(৫) শেষ পর্যন্ত মাতৃভূমি ছেড়ে তিনি দেশত্যাগী হয়েছিলেন।

(৬) মদিনায় গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে পৌনে এক যুগ পরে আবার মক্কা শরীফে আসেন বিজয়ীর বেশে।

(৭) অতঃপর ঘোষণা করা হয়; এখন থেকে মক্কায় আল্লাহর ঘরে কোন প্রতিমা থাকবে না। এমন কি ইব্রাহিম (আ) ও ঈসা (আ) এর প্রতিমাসহ সব প্রতিমা ভেঙ্গে দাও। এখন থেকে চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে, যেনা করলে দোররা মারা হবে..... এখন থেকে সমাজের প্রতিটি কাজই হবে ইসলামের তথা আল্লাহর বিধান মুতাবিক। এ সব কথাগুলো দেখুন তো চিন্তা করে পূর্বে শুনেছেন কি না? নিশ্চয়ই শুনেছেন। এখন মিলেয়ে দেখুন আমার এই কথাগুলো যা আপনি চিন্তা করেছেন যে এ তো পূর্বে শুনিনি তা কি নবীর জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না কি সংঘাত সৃষ্টিকারী?

এর পরও যদি কেউ বলতে চান যে আল-কুরআন ও কালেমা তাইয়্যেবা আমরাও তো পড়ি কিন্তু তা তো আমাদের দৃষ্টিতে আন্দোলনী কিংবা শ্লোগানের কালেমা হিসাবে ধরা পড়ে না তাহলে আমি বলবো—মানুষ একই জিনিস একই সঙ্গে একই আকৃতিতে দেখে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের কারণে চোখের দেখাও ভিন্নরূপ হয়ে যায়। যেমন চাদের ভেতরের কালো দাগকে কেউ দেখে "চাদের মা বুড়ী কুঁজো হয়ে বসে সুতো কাটছে" আর কেউ দেখে চাঁদের কালো পাহাড় পর্বত হিসেবে ওগুলোকে, আর কেউ দেখে চাঁদের গায়ের খাদ গর্ত যেখানে সূর্যের আলো পড়ে না—পড়ে ছায়া, তাই এমনতর কালো দাগ দেখায়। একই চাঁদকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখায় তেমন একই কুরআন ও একই কালেমাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মনে হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

চাঁদের বিভিন্ন রূপ দেখার মধ্যে যেমন কোনটার যুক্তি নেই এবং কোনটার স্বপক্ষে যুক্তি আছে, ঠিক তেমনই চিন্তা করুন আমার উপস্থাপিত কথার সঙ্গে নবী জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর যুক্তিসঙ্গত মিল আছে কি নেই। তাহলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। অতঃপর দেখা যাক এ কালেমার আহবানে আরবের লোক যারা আরবী মাতৃভাষা হওয়ার কারণে তা ভালোই বুঝতো তাদের প্রতিক্রিয়া কিরূপ ছিল। দেখা যায় রাসূল (স) কে যারা আল-আমিন উপাধি দিয়েছিল তারাই শেষ পর্যন্ত ও আহবানে সাড়া দিলো না। তারা কেউই স্বীকার করতে চাইলো না এ কালেমার আহবানকে মেনে নিতে। তারা পরিস্কার ভাবে বুঝল যে, এ কালেমার দাবী মেনে নেবার অর্থই হলো বর্তমানে যে শক্তি ও প্রভুত্ব ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে কিছু কিছু করে তাদের —

(ক) গোত্রপতিদের মধ্যে,

(খ) উপ-গোত্রপতিদের মধ্যে,

(গ) ধর্মযাজকদের মধ্যে,

(ঘ) ধর্মীয় উপনেতাদের মধ্যে,

(ঙ) একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে,

(চ) ওস্তাদ গুরুজনদের মধ্যে এবং

(ছ) বিভিন্ন ধরনের কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যে —

তা সব ওদের প্রত্যেকের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কেন্দ্রীভূত করা হবে আল্লাহর হাতে। তাতে সর্বনাশ হবে ঐ ৭ শ্রেণী কায়েমী স্বার্থবাদীদের। কায়েমী স্বার্থবাদীরা চিন্তা করলো যে, এমন এক কালেমার দাওয়াত উত্থাপন করা হয়েছে যা মানুষের মন-মস্তিষ্কে একবার স্থান পেলে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হবে আল্লাহর বিধান মোতাবিক। আর কোন প্রাধান্যই আমাদের হাতে রইবে না। অতঃপর আমরা যাদের ওপর ষোলআনা কর্তৃত্ব করি তাদের উপর আমাদের আর এক আনাও কর্তৃত্ব থাকবেনা। আর যাদেরকে জন্তু জানোয়ারের ন্যায় মনে করি তারাও আমাদের সমপর্যায়ে এসে যাবে। এটা প্রভু গোষ্ঠি মোটেই বরদাস্ত করতে পারছিল না। তাই তারা মরিয়া হয়ে লেগে গেল রাসূলের আন্দোলনকে দমন করার কাজে। কিন্তু রাসূল (স) তার কাজ চালিয়েই যেতে থাকলেন। যারা ২/৪ জন করে ইসলাম গ্রহণ করছিলেন তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে যোদ্ধা বানানো হচ্ছিল এবং দাওয়াতি ও আন্দোলনী কাজ সমান তালে জারী রাখা হয়েছিল। লক্ষ্য

www.pathagar.com

করলে দেখা যায় সে সময় যারা মুসলমান হচ্ছিলেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন গরীব শ্রেণীর লোক। যারা ছিলেন (১) শোষিত (২) নির্যাতিত (৩) অত্যাচারিত (৪) অবহেলিত (৫) উৎপীড়িত (৬) ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী এবং (৭) যারা ছিলেন সৎ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং জ্ঞানীগুণী লোক। মুসলমান হয়েছিলেন তারাই। কিন্তু যারা ছিল (১) শাসক ও গোত্রপতি, (২) শোষক ও সামন্ত প্রভু (৩) পাদ্রি বা ধর্মপ্রভু (৪) ধর্মযাজক বা ধর্মীয় নেতা (৫) অত্যাচারী জালেম, (৬) বিভিন্ন ধরনের কায়েমী স্বার্থবাদী, (৭) প্রভুত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের লোভী এবং (৮) অর্থ লোভী, তারা কিন্তু কেউই মুসলমান হতে পারেনি। অর্থাৎ পারেনি কালেমার বিপ্লবী দাওয়াতেকে মেনে নিতে।

সে যুগের মানুষের চাইতে সম্ভবত আমরা এযুগের মানুষ খুব চতুর। তাই আমরা এমন সুকৌশলে কালেমার মূল আহবানকে আড়ালে রাখি যেন ভয়ে কেউ সরে না যায়। তাই উপরোল্লিখিত সব শ্রেণীর লোকই আমাদের দাওয়াত কবুল করেন।

আর সে যুগের দাওয়াত ও এ যুগের দাওয়াতের মধ্যে আরো ক'টি পার্থক্য রয়েছে। তাহলো (১) আমাদের দাওয়াত জন্মগত মুসলমানদের প্রতি আর তাদের দাওয়াত ছিল মানব গোষ্ঠির প্রতি (২) আমাদের দাওয়াত সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েমের প্রতি নয় এবং কোন আন্দোলনের দাবীও আমাদের নেই কিন্তু সে যুগের দাওয়াতে তা ছিল। তারা বুঝতেন যে ইসলামী আইন রাষ্ট্রীয় পার্যায়ে বহাল না হলে সে আইনের কোন মূল্য থাকে না তাই ইসলামী আইন কায়েম করার লক্ষ্যে তারা জীবন দান করাকেই জীবনের সাফল্য বলে বিশ্বাস করতেন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য

এই কালেমার মধ্যে বলা হয়েছে 'লা ইলাহা' নেই কোন মুনিব বা হুকুম কর্তা 'ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ছাড়া। অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মুনিব বা হুকুম দাতাকে মুনিব বা হুকুম কর্তা হিসাবে মানি না। এবার খোঁজ করে দেখা দরকার মানুষের উপর আল্লাহ ছাড়া আর কে কে হুকুম দাতা হিসাবে কাজ করে ঃ

(১) মানুষের নিজের নফ্স বা মন ঃ যে চুরি বা যেনা করে সে নিশ্চয়ই আল্লাহর হুকুমে করে না; করে তার মনের হুকুমে।

www.pathagar.com

(২) পিতা- মাতা, ওস্তাদ গুরুজন

(৩) গ্রাম্য মাতাব্বর।

(৪) সমাজের প্রথা প্রচলন। যেমন – পৌষ মাসে গোলা থেকে ধান বের করা যাবে না, রবিবার বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটা নিষেধ, স্বামী ভাশুর ও শশুরের নাম উচ্চারণ করা মহাপাপ। ছেলে, মেয়ের আকিকা না করলেও ষষ্টির কামান পালতেই হবে ইত্যাদি আল্লাহর হুকুম নয়; সামাজিক প্রথা মাত্র।

(৫) অনুকরণঃ যেমন– সুট, কোট, নেকটাই পরা, দাড়ি মুন্ডান এ সবই অনুকরণ মাত্র।

(৬) উপরওয়ালাঃ যাদের অধীনে চাকুরী করে সে সব উপর ওয়ালাগণ।

(৭) রাষ্ট্রীয় আইনঃ রাষ্ট্র কর্তৃক সুদের বাধ্যতামূলক লেনদেন, মদ ও জুয়ার অনুমতি, যেনার লাইসেন্স, নর-নারীর অবাধ মেলামেশায় সরকারী নিয়ন্ত্রণহীনতা অশ্লীল ও পর্ণো ছায়াছবি তৈরী ও আমদানীর অবাধ অনুমতি ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় আইনের ছত্রছায়ায় হয়ে থাকে।

এরা সবাই মানুষের উপর হুকুম কর্তা।

বলা বাহুল্য এই ৭টিই হচ্ছে কালেমার রাস্তায় চলার পথে প্রধান বাধা। কারণ এদের হুকুম যদি খোদার হুকুমের বিপরীত হয়ে যায় তবে কিছুতেই এদের হুকুম মানা যায় না। অথচ এসব শক্তি মানুষকে বাধ্য করে তাদের হুকুম মত চলতে। আর কালেমা পড়া লোক যদি তাদের হুকুমে চলে তবে অবশ্যই তারা পুরা মুসলমান থাকতে পারে না। তাই কালেমার দাবী পূরনের উদ্দেশ্যেই কালেমা পড়া মুসলমানদের করতে হয়েছিল ঃ (১) দাওয়াতি কাজ (২) আল জামায়াত (৩) তা'লীম বা শিক্ষা (৪) তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণের কাজ (৫) জিহাদের ট্রেনিং ও জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ার কাজ (৬) পরকালের জবাবদিহির ভিত্তিতে খোদায়ী খেলাফত কায়েম করার কাজ এবং (৭) যেন মানুষের প্রতিটি আচরণই ইবাদতে পরিণত হয় এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়ার কাজ।

আমি বুঝিনা যে বিংশ শতাব্দীর মানুষ যারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী তারা কালেমা পড়বেন অথচ ঐসব বিষয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করবেন না, এ কেমন বুদ্ধির পরিচয়। যারা একথা বোঝেন যে ট্রানজিষ্টারের মিটার সামান্য একটু ঘুরিয়ে দিলেই এক সেন্টারের কথা বন্ধ হয়ে অন্য সেন্টারের কথা আসা শুরু হয়ে যায় তারা কি করে বোঝেন না যে কালেমার দাবীর মধ্যে সামান্য কিছু

www.pathagar.com

পরিবর্তন করলেই বেহেশতের রাস্তা থেকে মানুষ গোমরাহীর রাস্তায় উঠে যায়। তারা কি এ কথাটা একটু ভেবে দেখবেন না যে, সে যুগের কালেমা চাইতো মানুষের প্রভুত্ব খতম করে খোদায়ী প্রভুত্ব কায়েম করতে, মিথ্যা খোদার দাবীদার নমরূদ, ফেরাউন, শাদ্দাদ, আবু জেহেল ও আবু লাহাবদেরকে সিংহাসনচ্যুত করে খোদার খেলাফত কায়েম করতে। আর আজকের কালেমা? আজ আর সেই হায়দারী হুংকারের গরম কালেমা নেই। এ কালেমা হয়ে গেছে ঠান্ডা বরফের ন্যায়। আজকের কালেমা আল্লাহর প্রভুত্ব চায় না, খেলাফতও চায় না, চায় এক মুঠো ভিক্ষা। তাই আজকের কালেমায় কারো রাজসিংহাসন কেঁপে ওঠে না; কেঁপে ওঠে আটা বা চাউলের ভাড়। এই হল এ যুগের কালেমার ফলাফল।

আর নবী যুগের কালেমার দাওয়াতের ফলাফল ছিল কমপক্ষে ৭×২ = ১৪টি। যথা ঃ—

(১) খতম হল মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব, ফলে মানুষ পেল মানুষের মর্যাদা।

(২) অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম নির্যাতন খতম হল চিরতরে।

(৩) অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হল, মানুষ পেল মানুষের মত বাঁচার অধিকার।

(৪) অশ্লীল কাজ ও বেহায়াপনা বন্ধ হল।

(৫) দাস প্রথা খতম হল।

(৬) সন্তান হত্যা বন্ধ হল।

(৭) নারী নির্যাতন বিদায় হল।

(৮) দূর হল কুসংস্কার।

(৯) মানুষকে দিয়ে মানুষের আর কোন ভয় রইল না।

(১০) মানুষের যাবতীয় কাজ ইবাদতে পরিণত হল।

(১১) মুসলমান সারা বিশ্বের সেরা জাতি হিসাবে পরিগণিত হল।

(১২) জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানরা হল সারা পৃথিবীর ওস্তাদ।

(১৩) মুসলমানদের হাতে এল বিশ্বনেতৃত্ব।

(১৪) মানুষের জীবনে ফিরে এল নির্ভেজাল শান্তি, মানুষ খুশীতে নেচে উঠল।

www.pathagar.com

এ ছিল সে যুগের কালেমার দাওয়াতের ফলাফল। এ কথা কি কেউ অস্বীকার করবেন? এ কালেমা আজও আমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারে সেই হারানো মর্যাদা যা একদিন কালেমার বদৌলতে আমরা পেয়েছিলাম। এ সবই আমরা মানি কিন্তু মানিনা শুধু একটি জিনিস, তা হল 'শক্তিধরদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া' এর জন্য কালেমার অর্থকে পালটে দিয়েছি। আন্দোলন, জিহাদ ও রাজনীতিকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছি এবং ঝামেলা এড়ানোর সহজ পথ ধরেছি ফলে কালেমা প্রভুত্ব চাচ্ছে না; চাচ্ছে এক মুঠো ভিক্ষা। অথচ এই কালেমাই একদিন চেয়েছিল মানুষের প্রভুত্ব খতম করে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করতে।

কালেমা চায় দেশে ইসলামী আইন

কালেমার দাবী হল দেশে ইসলামী আইন চালু হওয়া। কালেমা কেন দেশে ইসলামী আইন চায় একথা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে। আমরা বাস করব একটা আইনের দেশে এক প্রকার আইন মেনে নিয়ে কিন্তু ইসলাম যদি সেই আইনের বিপরীত আইন চায় তাহলে মনের শত আগ্রহ থাকলেও তা মেনে চলা যায় না। এটা আমরা খুব ভাল ভাবেই বুঝি। কিন্তু যেহেতু ইংরেজ আমল থেকে গায়রে ইসলামী আইন কানুন মেনে চলে ঐ পথে এমন ভাবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে জানা কথাকেই নুতন করে জানতে গিয়ে হিম সিম খেয়ে যেতে হয়।

আইন কাকে বলে ঃ সর্বময় ক্ষমতার পক্ষ হতে যে নির্দ্দেশ আসে ঐটার নামই আইন। আইনের পিছনে যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা না থাকে তা হলে তার নাম কোন কেতাবেই লেখে না যে তাকে 'আইন' বলা হয়। আর আইন হলেই তার সঙ্গে কম পক্ষে দুটো জিনিস থাকতে হবে ঃ

(১) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অর্থাৎ পুলিশ বিভাগ।

(২) আইন সংরক্ষণকারী সংস্থা অর্থাৎ বিচার বিভাগ।

যেমন দেখুন আমাদের বাংলাদেশে আইন আছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশ বিভাগ আছে যাদের মাধ্যমে আইনকে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আর আইনের যেন কোন প্রকার অপপ্রয়োগ না হয় তা দেখার জন্য বিচার বিভাগও রয়েছে ফলে আইন দেশে কার্যকর হতে পারছে। কিন্তু আমরা মুখে দাবী করি

www.pathagar.com

ইসলামের আইন রয়েছে— হ্যাঁ, রয়েছে একথা ঠিকই কিন্তু সাইকেল থাকলে তার যেমন চাকা থাকা লাগে তা নাহলে সাইকেল চলতে পারে না ঠিক তেমনই ইসলামী আইনের প্রয়োগকারী কোন সংস্থা ইসলামের হাতে না থাকার কারণেই ইসলামী আইন কেতাবে থাকলেও সমাজে তা কার্যকর হতে পারে না। যেমন ইসলামের আইন বলে চোরের হাত কেটে দাও, ডাকাতের এক পাশের হাত এবং অপর পাশের পা কেটে দাও ইত্যাদি। এসব আইনের পিছনে নেই রাজশক্তি আর নেই, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আইন সংরক্ষণকারী সংস্থা। তাই হাত কাটা পা কাটা আইন কোনদিন এখানে কার্যকর হতে কেউ দেখেনি। কারণ এখানে ইসলামী হুকুমত নেই। ইসলামী আইন যেন সমাজে কার্যকর হতে পারে সে জন্যেই আল্লাহর নবী একটানা বিরামহীন সংগ্রাম করেছেন ২৩ বছর। এর পর যখনই ইসলামের হাতে রাষ্ট্রব্যবস্থা এসে গেছে এবং যখনই ইসলামী আইনের পিছনে রাজ ক্ষমতা যোগ হয়েছে তখনই ইসলামের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও তৈরী হয়েছে ইসলামের বিচার বিভাগও হয়েছে এবং চুরি করলে তার হাত কাটাও সম্ভব হয়েছে। আর যত দিন পর্যন্ত ইসলামের হাতে রাজশক্তি আসেনি ততদিন পর্যন্ত ইসলামের কোন আইনই সমাজে কার্যকর হতে পারেনি। এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে ঐ সংক্ষিপ্ত ২৪টি অক্ষর বিশিষ্ট ৭শব্দের কালেমার মধ্যে। আশা করি আমরা বুঝতে সক্ষম হব।

সাবধান! আজ সারা বিশ্বে এ কালেমার দ্বারা এক শ্রেণীর লোক সবার অলক্ষ্যে জাবরিয়া মতবাদের দিকে সাধারণ লোকদেরকে আহবান জানাচ্ছে। জাবরিয়া এক বাতিল সম্প্রদায়। তারা মনে করে (১) "আল ইনসানু কাল জামাদ" "মানুষ জড় পদার্থের ন্যায়" (২) তার নিজের কিছুই করার নেই (৩) "আল্লাহ যা করায় মানুষ তাই করে" (৪) ফেরাউন, নমরূদ যারা বাদশাহ হয়েছিল তাদেরকে আল্লাহই বাদশাহ করেছিলেন, কাজেই (৫) তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলার নেই। (৬) যা কিছু হয় তা সবকিছুই আল্লাহ থেকেই হয়। কালেমা যদি এই মতবাদ প্রচার করে তবে এ কালেমাকে স্বাগতম জানাবে নমরূদ, ফেরাউন, শাদ্দাদ ও তাদের তামাম অনুসারীরা। বিরোধিতা করবে না এর কেউ-ই।

কিন্তু যদি বেহেশত পাওয়ার জন্যেই এ কালেমাকে পড়তে হয় তবে কুরআন হাদিস ও রাসূলের জীবনীর সঙ্গে কালেমাকে মিল করে দেখুন এবং অত্যন্ত

www.pathagar.com

পরিষ্কার মনে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে আমার এ ক্ষুদ্র আলোচনাটুকুর উপর চিন্তা ভাবনা করুন। অতঃপর আপনার খালেছ মন থেকে যা সাক্ষ্য পাবেন সেই মুতাবেক কাজ করুন। তবে নিশ্চয়ই কালেমা আমাদেরকে উদ্ধার করবে ইহকালের অশান্তি থেকে এবং পরকালের শাস্তি অর্থাৎ ৭টি দোজখ থেকেও। এরপর আমরা কালেমা শাহাদাতের উপর আলোচনা করব।

www.pathagar.com

কালেমা শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সার্বভৌমত্বের মালিক নেই, তিনি একক সত্ত্বা, তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মোহাম্মদ (স) তার বান্দা ও রাসূল।

কালেমা শাহাদাতের বিপ্লবী ঘোষণা

ইসলামের দ্বিতীয় কালেমাই হচ্ছে কালেমা শাহাদাত বা সাক্ষ্যবাণী। এ কালেমাকে আমরা সাধারণত তিন জায়গায় পড়ে থাকি— (১) শুধু কালেমা পড়ার ক্ষেত্রে, (২) আজানের মধ্যে, এবং (৩) আত্তাহিয়াতুর মধ্যে। এ কালেমাকে অবলম্বন করে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। সেই প্রশ্নগুলির জবাবই দেবো ইনশাআল্লাহ। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ ঃ যথা—

১। এর নাম কালেমা শাহাদাত হল কেন?

২। এটা ২য় কালেমা হল কেন?

৩। আজান ইকামতে কেন তা পড়া হয়?

৪। শাহাদাত বা সাক্ষ্য মানল কে?

৫। কার নিকট সাক্ষ্য দেব?

৬। কেন সাক্ষ্য দেব?

৭। কি সাক্ষ্য দেব?

৮। কিসের মাধ্যমে সে সাক্ষ্য দেব? শুধু কি কথার মাধ্যমে?

www.pathagar.com

৯। আত্তাহিয়াতুর মধ্যে এই কালেমায়—"ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু" কথাটা নেই কেন?

১০। ইসলামী জীবন-জিন্দিগীতে এ কালেমার গুরুত্ব কতটুকু?

এর নাম সাক্ষ্যবাণী হল কেন এবং এটা ২য় কালেমা হল কেন?

আমরা প্রথম কালেমা পড়ে আল্লাহর নিকট শপথ গ্রহণ করেছিলাম এই মর্মে যে আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো হুকুম মানব না। আর আল্লাহর হুকুম গ্রহণ করব তার রাসূলের নিকট থেকে। তাহলে আইনত এর পরবর্তি কাজটা হতে হবে এমন যেন আমাদের যে কোন কাজ বা যে কোন আচরণই হোক না কেন তা দেখে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি এ কাজ কেন করলে, তা হলে তার জবাবে যেন বলতে পারি যে, আল্লাহর হুকুম অথবা নবীর নির্দেশ, তাই করেছি। যেমন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কেন নামায পড়? কেন রোজা রাখ? কেন হজ্ব কর? যাকাত দাও? তাহলে এর প্রত্যেকটির জবাবে বলি 'আল্লাহর হুকুম তাই করি', ঠিক এইভাবে জবাব দিতে হবে কালেমা তাইয়েবা পড়া মুসলমানদেরকে তাদের প্রত্যেকটি কাজের বেলায়। অর্থাৎ আমাদের কথাবার্তা, চালচলন, আচার-অনুষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী, চাষাবাদ, লেনদেন, শিক্ষাদীক্ষা, চিন্তাভাবনা, শিল্পকলা, অর্থ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিচার ফয়সালা, যুদ্ধ, সন্ধী-চুক্তি আন্তর্জাতিক নীতিনির্দ্ধারণ এর প্রত্যেকটি ব্যাপারে কালেমা পড়া মুসলমানদের কাজ হবে আল্লাহকে ইলাহ্ বা একমাত্র হুকুমদাতা হিসাবে মানার ভিত্তিতে।

তাই নবী (স) যখন থেকে ১ম কালেমা পড়েছেন ও তার প্রচার শুরু করেছেন তখন থেকেই তিনি চেষ্টা শুরু করেছেন, কালেমা ভিত্তিক সমাজ গড়তে। এভাবে চেষ্টা করে যখনই তিনি বুঝেছেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গীসাথীদেরকে আল্লাহর দ্বীনের পথে চালাতে পারছেন তখন তিনি কালেমা শাহাদাত নিজে পড়লেন ও তাঁর সঙ্গীসাথীদেরকে পড়তে বললেন। এর দ্বারা ঘোষণা করা হল যে, আমি কালেমা তাইয়েবায় যা পড়েছি বা যা অঙ্গিকার করেছি তা সত্যই আমার বাস্তব জীবনে মেনে চলি। এই দেখ আমার বাস্তব

www.pathagar.com

জীবনই তার সাক্ষি। কালেমা তাইয়েবা পড়া ব্যক্তিদের সামনে একটা প্রশ্ন সর্বদাই এবং প্রতিনিয়তই ভাসমান অবস্থায় উপস্থিত রয়েছে, তা হল এই যে, তুমি কালেমা তাইয়েবা পড়ে যা স্বীকার করে নিয়েছ, তোমার সামগ্রিক জীবনযাপন কি সেই মুতাবিক করছ? তার জবাবই হচ্ছে কালেমা শাহাদাত। অর্থাৎ কালেমা তাইয়েবায় বলেছিলাম لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর পরে আমাকে প্রশ্ন করা হল যে, তা কি তুমি তোমার বাস্তব জীবনে মেনে চল? যদি তা মেনে চলি তা হলে আমি বলব- اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অর্থাৎ আমার নিজেকে তার প্রমাণ হিসাবে হাজির করছি যে, আমি সত্যই আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসাবে মেনে চলি। তাই অন্য কারো হুকুম মানিনা এবং আল্লাহর নিরংকুশ প্রভুত্বের মধ্যে আমরা আর কাউকে শরীক বা অংশীদার করিনা অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কারো তৈরী আইন কানুন মেনে চলিনা। আমরা যাকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে মেনে নিয়েছি তারই দেয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করি। আমরা যে তা করি এই দেখ আমাদের বাস্তব জীবনই তার প্রমাণ। এই হল প্রকৃতপক্ষে এ কালেমার আসল মর্মকথা—এই জন্য এটা মুসলমানদের জন্যে হল দ্বিতীয় কালেমা।

আজান ইক্বামতে কেন কালেমা শাহাদাত

আজান শব্দের বাংলা অনুবাদ ঃ দূর থেকে লোকদেরকে আহ্বান করা। আহবান শুরু করা হয় 'আল্লাহু আকবার' বলে। আল্লাহু আকবার অর্থ 'আল্লাহ সব চাইতে বড়'; একথাটা প্রত্যহ আজান ইকামাত ও ফরজ ওয়াজিব এবং সুন্নাত নামায মিলিয়ে মোট ২৩৮ বার বলতে হয়। এ কথা কেন বলতে হয় তা বুঝার পরই আজানে কেন কালেমা শাহাদাত তা বুঝা যাবে।

আজানের উদ্দেশ্য ২টি (১) মুসল্লীদের নামাযের জন্য ডাকা (২) ইসলামের দিকে সাধারণভাবে সবাইকে আহবান জানান। এই আহবানের প্রথম কথাটাই হচ্ছে 'আল্লাহ সব চাইতে বড়' একথা বলার অর্থ হল শয়তান মানুষকে ধোকা দেয়, সে মানুষের মাথায় তাদের জ্ঞানের অগোচরে এমন একটা ধারণা ঢুকায় যে, আল্লাহ ছাড়া আরো এমন অনেক শক্তি রয়েছে যারা কোন কোন ব্যাপারে আল্লাহর চাইতে বড় (নাউযুবিল্লাহ)। যেমন ঃ কোন ব্যাপারে ফেরাউন বড়, কোন ব্যাপারে আবু জেহেল বড়, কোন ব্যাপারে আব্রাহাম লিংকন বড়, কোন ব্যাপারে

www.pathagar.com

লেনিন বড়, কোন ব্যাপারে কার্ল মার্কস বড়, কোন ব্যাপারে মাও সেতুং বড়—এইভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে মানুষ বিভিন্ন ব্যক্তিকে, কোথাও শক্তিকে, কোথাও বস্তুকে বড় মনে করে। তাই, যে মুসলমান জাতি আল্লাহকেই সব চাইতে বড় বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং যা মহাসত্য, তা প্রতিদিন কমপক্ষে ৫ বার ঘোষণা দেয় সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে। কারণ যা মহাসত্য তা যদি আমি ঘোষণা করার মত মনোবল না রাখি তবে আমি যে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান বলে মেনে নিয়েছি এবং এটাই যে মহাসত্য তার প্রমাণ কোথায়? তাই আজানের প্রথম কথায়ই ঘোষণা করা হয় যে, "আমার আল্লাহই সব চাইতে বড়"। হে দুনিয়ার মানুষ তোমরা শোন এবং মানো। অতঃপর আমি যখন ঘোষণা করব যে, আল্লাহই সব চাইতে বড়, তখন আমার সম্মুখে প্রশ্ন এসে হাজির হয় যে, তুমি যা বলছ তা কি তুমি মান? তারই জবাবে বলতে হয় কালেমা শাহাদাত—এর কথাগুলি অর্থাৎ আমি আল্লাহু আকবার বলে যা ঘোষণা করছি আমি তা বাস্তব জীবনে মানি। আমি যে তা মানি তার সাক্ষ্য আমার বাস্তব জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ। মুয়াজ্জিন যখন এসব কথা বলে আজান দেন তখন অন্যান্যদেরকেও সে কথাগুলি উচ্চারণ করতে হয় এই জন্যে যে, শুধু মুয়াজ্জিনেই নয়, বরং আমরাও তার সাক্ষ্য।

তাহলে বলুন, এভাবে আজান দেয়ার ও এভাবে কালেমা শাহাদাত পড়ার অধিকার কখন আমাদের থাকতে পারে। যখন সত্যই আমরা জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নিরংকুশভাবে আল্লাহর প্রভুত্বকে মেনে নিয়ে সেই মুতাবিক চলা শুরু করি তখন এভাবে কালেমা শাহাদাত পড়ার অধিকার আমরা পাই। নইলে কালেমা শাহাদাত পড়লে কালেমা পড়া হয় ঠিকই কিন্তু কালেমার মধ্যে যা বলি, আর বাস্তবে যা করি, তার মধ্যে মিল থাকেনা মোটেই। ফলে কথা ও কাজে মিল না হলে তার নাম হয় মুনাফিক—অর্থাৎ বাস্তব জীবনে কালেমার উপর না চলে কালেমা পড়লে মুসলমানিত্ব নষ্ট হবে,তা আমি বলছি না, তবে তাতে কমপক্ষে মুনাফিকের খাতায় অবশ্যই নাম উঠবে।

তাহলে আজানে ইকামতে কেন কালেমা শাহাদাত পড়ি তা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে অবশ্যই বুঝা গেল। আর বুঝা গেল কেনইবা আজানের জবাব দিতে হয়। জবাব দিতে হয় এই জন্য যে, মুয়াজ্জিন যা ঘোষণা করেছেন তা শুধু মুয়াজ্জিনেরই ঘোষণা নয়, তা আমাদেরও ঘোষণা।

www.pathagar.com

সাক্ষ্য মানল কে?

সাক্ষ্য মেনেছে খোদ আল্লাহ। আল্লাহর ভাষায় আল্লাহ বলেছেন— إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থাই হচ্ছে ইসলাম। তাই আমাদের দাবী যে, اَلْإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ ইসলামই একমাত্র খাঁটি দ্বীন—যা মেনে চললে ইহকালের ও পরকালের জীবনে শান্তি পাওয়া যাবে। আর কুফরী মতবাদগুলি সবই বাতিল—যা মেনে চললে ইহকালেও অশান্তি, পরকালেও অশান্তি। আমাদের এ দাবী ইথারের মাধ্যমে আমরা পেশ করি দুনিয়ার তামাম মানুষের সম্মুখে।

কার নিকট সাক্ষ্য দিব?

আল্লাহর কথা এবং আমাদের দাবী যে ঠিক তার প্রমাণ চায় বিশ্ববাসী যারা ইসলাম মানে না তারা সবাই। তাই আল্লাহ আমাদেরকে সাক্ষী মানলেন যে, হে মুসলিম জাতি যারা إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ কথাকে মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছ তারা ইসলামের পথে চলে সারা দুনিয়ার মানুষকে দেখাও যে আল্লাহ সত্য সত্যই বলেছেন ইসলামই আল্লাহর মনোনীত দ্বীন যা মেনে চললে দুনিয়ার জীবনেও পরম শান্তি পাওয়া যায় এবং পরকালেও পরম শান্তি পাওয়া যাবে। আল্লাহ যে সাক্ষ্য দিতে বলেছেন— এটা আমার কল্পনা নয় — এটা বাস্তব। এটা আল কুরআনের হুকুম। এ সাক্ষ্যর অর্থ নিজেকে বিশ্বের দরবারে প্রমাণ হিসাবে হাজির করা। আল্লাহ বললেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ

আমি তোমাদেরকে একটা মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি যেন তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষ্য বা প্রমাণ স্বরূপ হতে পার এবং রাসূলও যেন তোমাদের জন্য সাক্ষ্য স্বরূপ হতে পারেন। এর অর্থ এই যে, তোমরা হবে সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রমাণ স্বরূপ। তোমরা সঠিক পথে জীবনযাপন করছ তাই তোমাদের চরিত্রে কোন খুঁত নেই তা কেমন ভাবে প্রমাণ করবে? এর জবাবে আল্লাহ বলেছেন—وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا তোমাদের জন্যে রাসূল তার সাক্ষী।

www.pathagar.com

কেন সাক্ষ্য দেব?

সাক্ষ্য এ জন্যে যে, আল্লাহ বলেছেন, রাসূলের নিখুঁত চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তোমরা যেমন মুসলমান হয়েছ, তেমন যেন সারা দুনিয়ার মানুষ তোমাদের মধ্যে সে নিখুঁত চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করে। এই জন্যেই আমাদেরকে সাক্ষ্য দিতে হবে। এবার চিন্তা করুন, অন্য জাতির লোকের মধ্যে যে সব দোষ রয়েছে তা হুবহু যদি আমাদের মধ্যেও থাকে তবে অন্যান্য জাতি কি দেখে একথা মানবে যে, اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ ইসলামই ঠিক আর অন্য ধর্ম বেঠিক। আল্লাহ পাক অন্যত্র আরো স্পষ্ট করে বলেন যে, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কথা যে সত্য তার সাক্ষ্য স্বরূপ দাড়ায়মান হও।" আল্লাহর এ কথাগুলি নিছক কোন নীতিকথা নয়; এ হচ্ছে আল্লাহর কড়া হুকুম। এ নির্দেশের মূল তাৎপর্য এই যে, মুসলমানরা যা মুখে প্রচার করবে তা নিছক তাদের মুখের প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে না, তার প্রতিফলন ঘটবে বাস্তব জীবনে। মুসলমানদের বাস্তব জীবনের কার্যকলাপ, যথা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকুরি-বাকুরী, লেন-দেন, আয়-ব্যয়-সঞ্চয়, জ্ঞান-চর্চা, শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিচার-ফয়সালা, জাতীয় সম্পদ বন্টন, আন্তর্জাতিক নীতিনির্দ্ধারণ, যুদ্ধ , সন্ধি চুক্তি এর সবগুলিই হতে হবে আদর্শ স্থানীয় যা নির্ণীত হবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক আর এ সবের মাধ্যমে সারা দুনিয়াকে দেখাতে হবে যে দেখ আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, বৈষয়িক,সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন দিক ও রিভাগের প্রত্যেকটিই আদর্শ স্থানীয়। আরও সহজ ভাষায় ব্যাপারটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। অর্থাৎ আমাদেরকে দেখাতে হবে যে দেখ আমাদের মধ্যে জোর জুলুম নেই, অন্যায় অবিচার নেই, চুরি ডাকাতি, ফাঁকিবাজি, ফেরেব বাজি, ধোকাবাজি এসব নেই। চোরা কারবার, লোক ঠকানো কারবার, সুদী কারবার, মুনাফাখুরি কারবার এ সব আমাদের মধ্যে নেই। মিথ্যা আমরা বুঝিনা। নির্যাতন উৎপীড়ন এসবও আমাদের মধ্যে নেই। বেহায়াপনা ও অশ্লীল কোন কার্যকলাপ আমরা জানিনা। নারী নির্যাতন বা মাতৃজাতির প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ

www.pathagar.com

আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের মধ্যে শিরকের কোন গন্ধ বাতাস নেই। আমরা অতর্কিতে আক্রমণ, গুপ্তহত্যা, স্মাগলিং ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমাদের কথা ও কাজে কোন গরমিল নেই। তাই আমাদের সমাজে কোন অশান্তিও নেই। উপরোক্ত আয়াত শরীফে আল্লাহ পাকের এই নির্দেশটাই অত্যন্ত কড়াভাবে দান করা হয়েছে গোটা মুসলিম সমাজের উপর।

অতঃপর আল্লাহর দেয়া এ দায়িত্ব যদি মুসলমান আদায় না করে তবে তার অবস্থা কেমন হবে তা আল্লাহ বলেছেন নিম্নোক্ত ভাষায় وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ তার চাইতে বড় জালেম আর কে হতে পারে যার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে অথচ সে তা গোপন করে । অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের নিকট এমন নির্ভুল জীবনব্যবস্থা রয়েছে যা পালন করলে আমরা দুনিয়ার সামনে আল্লাহর কথার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ দন্ডায়মান হতে পারি। কিন্তু তা যদি না করি অর্থাৎ আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের নিকট আল কুরআনের মাধ্যমে সর্বাধিক সুন্দর জীবন ব্যবস্থা যা রয়েছে তা যদি জীবনের বাস্তব কার্যকলাপ দ্বারা প্রকাশ না করে গোপন করি, তবে আমাদের চাইতে বড় জালেম আর কেউ হবে না। অতঃপর যদি তা গোপন করেই চলি অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে কিভাবে জীবন যাপন করতে বলেছেন তা যদি আমাদের বাস্তব কার্যকলাপ দ্বারা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে না পারি তাহলে প্রকারান্তরে কুরআনী ব্যবস্থাপনা যা আল্লাহ আমাদের নিকট গচ্ছিত রেখেছেন— এজন্যে যে আমরা তা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরব— তা গোপন করা হয়। অমুসলমানরা তা জানতেই পারে না যে, মুসলমানদের নিকট কি সুন্দর জীবনব্যবস্থা রয়েছে। কারণ তারা আল-কুরআন পড়ে দেখে না দেখে মুসলমানদের চরিত্র। পূর্ব যামানায় এ সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব যাদের উপর ছিল তাদের মধ্যে যারা সে দায়িত্ব ঠিক মত পালন করেনি তাদের যে অবস্থায় পতিত হতে হয়েছিল তা আল্লাহ পাক নিম্নরূপ ভাষায় বলেছেন –

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ط

"লাঞ্ছনা গঞ্জনা অধঃপতন দুরবস্থা তাদের উপর চেপে বসল। আর তারা আল্লাহর গজবের মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল।" এর থেকে বুঝা যায় আজও যদি

www.pathagar.com

আমরা এই সাক্ষ্যদানে ব্যর্থ হই অর্থাৎ যে অবস্থায় কালেমা শাহাদাত পড়তে হবে সে অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারি তবে আমাদের উপরও তদ্রূপ গজব আসার কথা যা ইয়াহুদদের উপর এসেছিল। হিসাব করলে মনে হয় যেন সে ধরণের দূরবস্থা আমাদের উপরও মাঝে মাঝে আসে। আবার আল্লাহ আমাদের সুযোগ দেন এজন্যে যেন আমরা কালেমা শাহাদাত পাঠের উপযোগী হই।

'উপযোগী হই' কথাটার ব্যাখ্যা পুনরায়ও কিছু বলছি। যদি কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কারণে ভাল স্বাস্থ্যবান হয়, অর্থাৎ সে যদি মুহাম্মদ আলী ক্লের ন্যায় শক্তিশালী হয় তবে তখনই সে এ কথা বলায় উপযোগী হয় যে, "স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে সে যে সত্যই স্বাস্থ্যবান হয়, দেখ আমি তার সাক্ষী"—দেখ আমার নিখুঁত স্বাস্থ্য। এবার ধরুন দেশের সরকার সাধারণভাবে স্বাস্থ্য পালন সম্পর্কে সবাইকে উপদেশ দিলেন—আর বললেন আমার উপদেশ মেনে চললে তোমরা প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান হতে পারবে। গায়ে সিংহের ন্যায় শক্তি হবে—ইত্যাদি। অতঃপর কিছু লোক তা মানতে চাইল আর কিছু লোক তা মানতে চাইল না। এবার যারা তা মানতে চাইল তাদেরকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন আমি সরকারের পক্ষ হতে স্বাস্থ্য পালন সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছিলাম তাতে আমি বলেছিলাম, সরকারের দেয়া উপদেশ যে মেনে চলবে তার স্বাস্থ্য ভাল হবে। সরকারের এ কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে তোমরা তাদের সাক্ষী হয়ে যাও। অর্থাৎ তোমরা রুগ্নদের সম্মুখে তোমাদের স্বাস্থ্য নিয়ে দন্ডায়মান হও এবং তাদেরকে তোমাদের স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে বল। বল যে, এই দেখ সরকারের কথার সত্যতা আমাদের স্বাস্থ্য দিয়ে প্রমাণ করছি। এই ভাবে যদি ভাল স্বাস্থ্যবানরা তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে রুগ্নদের সম্মুখে নিজেদেরকে প্রমাণ স্বরূপ হাজির করতে পারে তবে নিশ্চয়ই রুগ্নরা এ কথা বলতে পারে না যে, তোমাদের স্বাস্থ্য পালনবিধি ভাল নয়, বরং তারা সরকারের দেয়া স্বাস্থ্যবিধি পালন না করে যে ভুল করেছে—এটা বুঝতে পারবে এবং স্বাস্থ্য বিধি নিজেরাও পালন করার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হবে। এবার বলুন স্বাস্থ্যবিধি পালন করা যে ভাল তার প্রমাণ বা সাক্ষ্য স্বরূপ সমাজের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়ার উপযোগী কে? যে স্বাস্থ্যবান সেই? নাকি যে রুগ্ন সে? এবার যদি একদল রুগ্নলোক যাদের গায়ের চামড়া হাড়ের সঙ্গে লেগে গিয়েছে—দাঁড়ানোর মত ক্ষমতাও যাদের নেই—তারা যদি আর একদল রুগ্ন—যাদের স্বাস্থ্য ওদের চাইতে অপেক্ষাকৃত কিছুটা ভাল—তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে যে, আমরা সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি, এর ফলে দেখ আমাদের কেমন উত্তম স্বাস্থ্য। দেখ আমরা নিজেদেরকে তার প্রমাণ স্বরূপ সমাজের সম্মুখে হাজির করছে। সমাজ দেখুক এবং বুঝুক যে,

www.pathagar.com

সরকারের উপদেশ মেনে চললে সে কেমন স্বাস্থ্যবান হতে পারে। তাহলে সমাজের সাধারণ লোক যারা সরকারের দেয়া স্বাস্থ্যবিধি পালনে বিশ্বাসী নয়, তারা মনে করবে যে, সরকারী উপদেশ না মেনে তো ভালই করেছি। যদি মানতাম তাহলে তো ওদের মত চামড়া হাড়ের সঙ্গে লেগে যেত। তখন এরূপ সাক্ষ্যদানের ফল দাঁড়াবে এই যে, (১) স্বাস্থ্যমন্ত্রী, যার মাধ্যমে সরকারী স্বাস্থ্য পালন নীতি পাই তাকে মানুষ ধোকাবাজ ও মিথ্যুক বলে মনে করবে। (২) তার কথা কেউই মানবেনা। (৩) কেউ যেন তা না মানে সে জন্য অবিশ্বাসীরা চরম চেষ্টা করবে। (৪) আর যারা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর উপদেশ আদতে মানে না কিন্তু মানার দাবী করে তারা যে সত্যই তা মানে কি না মানে সে খোঁজ অন্যেরা করবে না বরং তারা মনে করবে যে এরা সত্যিই মিথ্যা সরকারের নকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে এরূপ রুগ্ন হয়ে গেছে। এ বুঝ বুঝে এই রুগ্নদের সম্পর্কে তারা ধারণা করবে যে, এদের মত অধম নির্বোধ আর দ্বিতীয়টি কেউ হতে পারেনা কারণ এরা এমন বদ্ধ পাগল যে, ভুয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপদেশ মেনে মেনে এরা একেবারে শুকিয়ে হাড় হয়ে গেছে তবুও তাই মেনে চলবে। এ গোষ্ঠিকে তারা অধম, তালকানা, বদ্ধপাগল, নিরেট মুর্খ ইত্যাদি মনে করবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করলে জ্ঞানে এটাই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে যে, ঐ রুগ্ন ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যবানের দাবীদার হওয়াও যেমন, বর্তমান মুসলিম সমাজের কালেমা শাহাদাত পড়াও তেমন।

আল্লাহ আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা মুসলিম জাতি আমার নির্দেশ মেনে চল। তোমাদের জীবনের প্রতিটি দিকই সুন্দর হয়ে গড়ে উঠুক। চিরশান্তি নেমে আসুক তোমাদের জীবনে। দূর হয়ে যাক তোমাদের সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায় অপকর্ম। দুঃখকষ্ট চিরতরে বিদায় নিক তোমাদের জীবন থেকে । সারা দুনিয়ার মানুষ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখুক তোমাদের দিকে যে, তোমরা প্রতিটি দিক থেকেই পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা উত্তম এবং তোমাদের সমাজ একটি নিখুঁত বেহেশতি সমাজ। আর তা দেখানোর জন্যে অন্যদেরকে আহবান জানাও এই কথা বলে যে, اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

দুনিয়ার মানুষ দেখুক যে, মুসলমানরা মিথ্যা জানেনা—অন্যায় অপকর্ম বোঝে না। লোকের ক্ষতি করা জানেনা। সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, বেপর্দা, বেহায়াপনা বোঝে না। তাদের সমাজে মিথ্যা, ফাঁকিবাজি, ধোকাবাজি, মুনাফাখোরী, মজুতদারী, হাইজ্যাক, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদি ধরনের কিছুই নেই। এরই সাক্ষ্য বহন করা উচিত ছিল আমাদের সামগ্রিক সমাজব্যবস্থা দ্বারা । তাহলেই كُوْنُوْا

www.pathagar.com

قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ "ইসলামই যে খাঁটি জীবনব্যবস্থা তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রমাণ স্বরূপ দন্ডায়মান হও" এর হুকুম মুতাবিক আমাদের কালেমা শাহাদাতের মাধ্যমে সাক্ষ্য দানটা ন্যায়সঙ্গত হতে পারত। কিন্তু আমাদের সাক্ষ্যটা হল এমন যে, মুখে বলছি দেখ আমি কত সুস্থ ও কত সবল কিন্তু বাস্তবে হাড়ডি কংকালসার। উঠে দাঁড়ানোর মত ক্ষমতাও নেই। অর্থাৎ মুখে বলি— আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমার জীবন চরিত্র দিয়ে যে, আমি একমাত্র আল্লাহকেই প্রভু জেনে এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) কে তাঁর প্রেরিত রাসূল হিসাবে মেনে নিয়ে সেই মানার ভিত্তিতেই জীবনযাপন করি। যার কারণে আমাদের মুসলিম সমাজে শুধু শান্তি আর শান্তি। শুধু মঙ্গল আর মঙ্গল। শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ। এটা হল আমাদের মুখের ভাষা ও মুখের দাবী।

কিন্তু বাস্তবে আমাদের সাক্ষ্য হল এইরূপ যে, হে দুনিয়ার মানুষ তোমরা বাংলার মুসলমানদের দিকে চেয়ে দেখ। আমরা দুনিয়ার যত অপকর্ম আছে তার সবগুলিরই ওস্তাদ। হে দুনিয়ার অন্যান্য জাতি তোমরা যদি চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, মদমাতালি, হাইজ্যাক, গুপ্তহত্যা, স্মাগলিং, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, মানাফেকী, জালিয়াতি, ফাঁকিবাজি, ফেরববাজি,, ধোকাবাজি, এমন কি ফাঁকি দিয়ে নকল করে কিভাবে শিক্ষিত হওয়া যায় এসব যদি না জান তবে আস— আমরা বাংলার মুসলমানরা তা শিখিয়ে দেব। ওসব ব্যাপারে আমরা ওস্তাদ। কাজেই আমাদের কার্যকলাপ দেখে দুনিয়ার অন্যান্য জাতি মুসলমান হয়ে যাও। দেখ আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা মেনে আমরা কত হাজারও বিষয়ের ওস্তাদ বনেছি। হে দুনিয়ার মানুষ—তোমরা দেখ এবং বিচার কর যে, আল্লাহর এ কথাটা অর্থাৎ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ এটা কত খাঁটি কথা। এই হল কালেমা শাহাদাতের মাধ্যমে আমাদের সাক্ষ্য দান। এবার বলুন, আমাদের যা চরিত্র, এই যদি হয় আমাদের সাক্ষ্য দানের বিষয়বস্তু তাহলে কি দুনিয়ার অমুসলিম জাতি যারা আল কুরআন ও আল হাদিসের অনুসারী নয় তারা কি ইসলামকে সঠিক জীবনব্যবস্থা বলে মানবে? তারা তো মানবেই না বরং আমাদের সাক্ষ্যদানের ধরণ দেখে তারা (১) আল্লাহকে অস্বীকার করবে (২) আল্লাহর রাসূলকে ধোকাবাজ মনে করবে (৩) দুনিয়ার কেউ যেন আমাদের কথা না শোনে সে জন্য চেষ্টা করবে। আর (৪) আমাদেরকে মনে করবে চরম নির্বোধ, অধম, বোকা, নিরেট মুর্খ ও ধর্মীয় নেশাগ্রস্ত।

বলাবাহুল্য, আমরা কালেমা শাহাদাতের বাস্তব রূপ সমাজ জীবনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি, সাধারণ মুসলমান যারা ধর্মীয় ব্যাপারে পরিচালিত হন বাতিল

www.pathagar.com

পীর মুর্শিদদের দ্বারা তারা তো সত্যই অজ্ঞ অথচ ঈমান তাদের ঠিকই রয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় পরিচালকগণ তাদের বুঝাতে পারছেন না—শুধু বুঝাতে পারছে না তা নয় বরং তারা অনেক ক্ষেত্রে এমন বুঝাচ্ছেন যার ফলে শিক্ষিত মুসলমানরা ধোকায় পড়ে লেনিন, কার্ল মার্কস, মাও সেতুং প্রমুখ নাস্তিকদের অনুগামী হচ্ছে। দোষ তাদের নয় যারা নাস্তিক হচ্ছে; দোষ তাদের যারা মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা সেজে মুসলমানদের কমপক্ষে কালেমার ব্যাখ্যাটাও বুঝাতে পারছেন না। বরং তারা ধর্মটাকে করে নিয়েছেন বিনাপুঁজির ব্যবসায়ের একটা মূলধন। আজকার অবস্থা হচ্ছে এই যে, যারাই ধর্মীয় নেতা, যাদের উপর দ্বীনের তাবলীগের দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে তাদের অধিকাংশই তাবলীগ তো করেনই না বরং তাদের দাও শুধু টাকা। তারা পানিতে একটু ফুঁক দিলেই তাদের পাঁচটাকা পাওনা হয়ে যায়। তাঁরা মিলাদ পড়বে, বলবে দাও টাকা। মোরদার জন্য কিছু পড়ে সওয়াব রেসানি করবে বলবে দাও টাকা। এমনকি তারা মরলে তাদের কারও কারও কবরেও বলে দাও টাকা। তাদেরই কথা আল্লাহ বলেছেন— "হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমাদের অধিকাংশ পীর-মুর্শিদ জনগণের অর্থ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং তারা সাধারণ লোকদেরকে দ্বীনের পথে চলতে বাধা প্রদান করে (সূরা তওবা)।" এই যদি হয় ধর্ম প্রচারকদের অবস্থা, তাহলে যারা কুরআন হাদিস নিজে পড়েনি কিন্তু বোধ-শক্তি আছে, তারা নাস্তিক ছাড়া আর কি হবে বলে আমরা আশা করতে পারি? হাঁ, তবে যারা সংসারের কাজকাম ছেড়ে শুধু তাবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকবেন তাদেরকে টাকা অবশ্যই পেতে হবে। তবে সে পাওয়া পানিতে ফুঁক দিয়ে নয়; তা নিতে হবে ইসলামী সরকারের কাছ থেকে তাবলিগী ভাতা হিসাবে। কেউ যদি বলেন যে সরকার তো তা দেয় না— তাহলে এখন কি করব। আমি বলব সরকার তা নিশ্চয় দেবে তবে তা আদায় করার যোগ্যতা থাকতে হবে । মুসলমানদের টাকায় যেখানে মূর্তি কায়েম হতে পারে সেখানে মুবাল্লিগরা কি তাবলীগী ভাতা পেতে পারেন না? নিশ্চয় পারেন। কিন্তু সে ভাতা যদি আমরা পানিতে ফুঁক দিয়েই আদায় করে নেই তাহলে সরকারের কাছে তা চাইবই বা কোন মুখে আর সরকার তা দেবেইবা কেন? আর তাবলীগী ভাতা পেতে হলে আগে জিহাদ করা লাগবে, ইসলামী হুকুমত কায়েম করা লাগবে। তবেই সেই ইসলামী সরকার তাবলীগী ভাতা দেবে, এর পূর্বে নয়।

www.pathagar.com

কি সাক্ষ্য দেব এবং কিসের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেব

এখানে সাক্ষ্য অর্থ প্রমাণ। আমাদেরকে সমাজের সম্মুখে প্রমাণ করতে হবে যে ইসলামই একমাত্র খাঁটি জীবন-ব্যবস্থা। তা প্রমাণ করতে হবে আমাদেরকে আমাদের বাস্তব জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে— যা পূর্বে বলা হয়েছে। যেন অন্যান্য জাতি তা উপলব্ধি করতে পারে।

আত্তাহিয়াতুর মধ্যে কালেমা কেন এবং এর মধ্যে وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ কথাটা নেই কেন ?

নবী (স) যখন মি'রাজে গিয়ে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে প্রথমেই আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতকে উদ্দেশ্য করে বললেন "আত্তাতিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়েবাতু"—এর জবাবে আল্লাহ বললেন আস্সালামু আলাইকা আইয়োহান্নাবীয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পরে নবী বললেন, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস্সালেহীন।" এর পরই এসব কথা শুনে ফেরেশতাগণ পড়লেন কালেমা শাহাদাত অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বললেন যে, আমরা যে আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহ বলে স্বীকার করি, তার প্রমাণ আমরাই। সেখানে আল্লাহর সাথে শরীক করার মত কোন মগজ ওয়ালা ছিলনা তাই وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ বা তিনি এক, তার কোন শরীক নেই কথাটা বলার কোন দরকার হয়নি।

ফেরেশতাগণ যেমন বাস্তব জীবনে আল্লাহর আইন পুরা পুরি মেনে নিয়ে বলেছেন اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আমাদেরকেও তেমন বাস্তব জীবনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়িত করে নিয়ে বলতে হবে اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ইসলামী জীবন জিন্দিগীতে এ কালেমার গুরুত্ব কতটুকু

এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ কালেমা আমাদেরকে সর্বক্ষণই স্মরণ করায় যে, তোমাদের চরিত্রে ও বাস্তব জীবনে একমাত্র ইসলামেরই প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এ কথাটা প্রতি নিয়তই যেন আমাদের স্মরণে থাকে এবং কখনও যেন ভুল না হয় সে জন্যে (১) কালেমা শাহাদাত পড়ার বেলায় (২) আজান ইকামাতে এবং

www.pathagar.com

(৩) আত্তাহিয়াতুর মধ্যে পড়তে হয় এ কালেমাকে। এ কালেমা আমাদেরকে সর্বক্ষণই বলতে থাকে যে, তোমাদের চিন্তা-ভাবনা, শিক্ষাদীক্ষা, শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, জ্ঞান চর্চা, আমল, আখলাক, আচার আচরণ, লেন-দেন, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, যুদ্ধ সন্ধি চুক্তি থেকে শুরু করে জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে, এমনকি তোমাদের কৃষিক্ষেত্র, শিল্পকলা, কলকারখানা, রেডিও, টেলিভিশন, যানবাহন ইত্যাদির প্রত্যেকটিতেই যেন ইসলামের সৌন্দর্যের সাক্ষ্য বহন করে। তা যে করে, তারই ঘোষণা দেয়া হয় কালেমা শাহাদাতের মাধ্যমে। এ আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে এ কালেমার গুরুত্ব আমাদের বাস্তব জীবনে অপরিসীম। এ কালেমাসমূহ আমাদের মনে যে ঈমানের জন্ম দেয় এখন সে ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

www.pathagar.com

ঈমানের তাৎপর্য

ঈমানের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে হলে জানতে হবে নিম্নেবর্ণিত ঈমানের বিভিন্ন দিকগুলির সঠিক ব্যাখ্যা। যথাঃ—

(১) ঈমানের ৩টি অবস্থা, (২) ২টি কালেমা, (৩) ৭টি বিষয়বস্তু ও (৪) ২টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য । এর প্রত্যেকটি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়ার পরই একটা লোকের পক্ষে ঈমানদার হওয়া সম্ভব; নইলে নয়।

আমাদের ঈমান ও হুজুরে পাক (স) এর সঙ্গী-সাথীদের ঈমানের মধ্যে পার্থক্য

আমরা ঈমানের দু'টি কালেমা আরবীতে পড়ি আর বলি, হ্যাঁ, যা পড়লাম তা বিশ্বাস করলাম কিন্তু কি বিশ্বাস করলাম তা বাংলায় বুঝিয়ে বলতে পারিনা। অর্থাৎ আমরা যা বিশ্বাস করি বলে দাবী করি তা যে কি, তা আমরা জানিনা। এটাই হচ্ছে আমাদের ঈমান। আর ছাহাবায়ে কেরাম (রা)গণ তাঁদের মাতৃভাষায় ঈমানের দু'টি কালেমা পড়ে যখন ঈমান এনেছেন তখন তাঁরা বুঝেছেন যে তাঁরা কিসের প্রতি ঈমান আনলেন বা কিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। অর্থাৎ তাঁদের ঈমান ছিল বুঝে সুঝে আর আমাদের ঈমান হচ্ছে না বুঝেই। এর ফলে তাঁদের ও আমাদের চরিত্রের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। যেমন— তাঁদের বিশ্বাস মুতাবিক তাঁদের চরিত্র এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে হুজুর (স) একদিন মদিনা থেকে বললেন "আজ এখান থেকে একজন সুন্দরী রমনী বহু মূল্যবান জেওর গয়না পরে যদি হাজরামাউথ পর্যন্ত একা একা পায়ে হেঁটেও চলে যায় তবুও তার দিকে কেউ ফিরে চাইবে না।" তাছাড়া আরও বলেছেন "মুসলমান যা ই করুক না কেন সে কখনও মিথ্যা বলবে না এবং তার দ্বারা কারও কোন প্রকার ক্ষতি হবে না, অর্থাৎ মুসলমান কারও জন্যে ভয়ের কারণ হবে না।" এর বাস্তব নজীর দেখতে পাওয়া যায় আরবে ইসলামী খেলাফত কায়েম হয়ে যাওয়ার পর দোকানদার দোকান খুলে রেখে মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছে কিন্তু কেউ তার কোন মালে হাত দেয়নি। মানুষ ঘরের দরজা খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু কোন চোর ঘরে ঢোকেনি। আর আমাদের ঈমান মুতাবিক আমাদের আচরণ হচ্ছে এই যে অন্যান্যদের কথা বাদ দিলেও যারা বিশেষ করে

www.pathagar.com

মসজিদে নামাজ পড়তে যান তাদেরই উপর এমন একটা সাধারণ আস্থা নেই যে ছেঁড়া জুতা জোড়াও বাইরে রেখে নিশ্চিন্তে নামায পড়তে পারা যাবে। এ ছাড়াও এমন বহু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে একজন মুসলমানকে ততটুকু বিশ্বাস করতে পারে না যতটুকু বিশ্বাস করতে পারে একজন অমুসলিমকে। আমি মনে করি এর চাইতে লজ্জাষ্কর ঘটনা আর কিছু হতে পারে না যে, যে মুসলমান ছিল একদিন সারা বিশ্বের মধ্যে একমাত্র বিশ্বাসী জাতি, আর যাদের নবীর (স) উপাধিই ছিল 'বিশ্বাসী' বা 'আল আমিন' যাঁকে তাঁর চরম শত্রুরাও চরম বিশ্বাসী বা আল আমিন উপাধি দিয়েছিল, আর আজ সেই নবীর (স) উম্মতের মধ্যেই বিশ্বাসী লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এর চাইতে লজ্জার ব্যাপার আর কি হতে পারে তা আমার জ্ঞানে ধরে না। এখন প্রশ্ন, আজকের মুসলমানদের এ অবস্থা হলো কেন? এর জবাব, আজকের মুসলমান যে কি বিশ্বাস করে মুসলমান হয়েছে তা তারা বলতে পারে না। আর কিছু মুসলমান যারা বলতে পারেন তাদেরও অধিকাংশের ধারণা অস্পষ্ট, যার ফলে আজ আমাদের এ দুরবস্থা। এবার আসুন আমরা ঈমানের প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে কিছু বুঝার চেষ্টা করি।

ঈমানের ৩টি অবস্থা

ঈমান অর্থ না দেখে বিশ্বাস। মুসলমানদের আল্লাহ-রাসূল ও পরকাল সম্পর্কীয় না দেখা বিশ্বাসকেই ঈমান বলা হয়। শুধু এই ব্যাপারেই নয় বরং যে কোন ব্যাপারেই হোক না কেন, মানুষ যখনই কারও নিকট থেকে কোন খবর শোনে তখনই সে খবরটাকে ৩ অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় গ্রহণ করতে পারে। যথা ঃ — খবর শুনে—

১। কেউ মনে করতে পারে, 'সম্পূর্ণই সত্য খবর'।

২। কেউ মনে করতে পারে, 'সম্পূর্ণই মিথ্যা খবর'।

৩। কেউ মনে করতে পারে, 'হলেও হতে পারে সত্য কিংবা নাও হতে পারে সত্য'। মনের এই অবস্থাকে বলে সন্দেহ। ঠিক তদ্রূপ নবী রাসূল গণের মাধ্যমে আমরা পরকাল সম্পর্কে যে খবর শুনে আসছি তা বিশ্বাসের বেলায় বনি আদম ঐ ৩ ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ —

১। এক শ্রেণীর লোক শুনেছে এবং বিশ্বাস করেছে, তাদের বিশ্বাসে সন্দেহ সংশয় নেই।

২। কেউ শুনেছে, বিশ্বাস করেনি একটুও।

৩। কেউ শুনেছে শুনে ধাঁধাঁয় পড়েছে। তারা পুরাপুরি অমান্যও করেনি আবার তাদের কার্যকলাপে প্রমাণও হয় না যে তারা বিশ্বাস করেছে।

www.pathagar.com

বিশ্বাসের লক্ষণ

বিশ্বাসের লক্ষণ আমরা একটা উদাহরণ থেকে বুঝার চেষ্টা করি। মনে করুণ ৩ জন যুবক কোন পাড়াগ্রাম থেকে কোন টাউনে সিনেমা দেখতে যাচ্ছিল— পথে পানির পিপাসায় কোন এক বাড়ী থেকে পানি পান করল। এর পর এক ব্যক্তি খবর দিল যে ঐ পানি কোন এক পুকুরের ছিল, যে পুকুরে কলেরা রুগীর বমি ও পায়খানা ধোয়া হয়েছে। অতএব ঐ পানির সঙ্গে তোমরা কলেরার জীবাণু পান করে ফেলেছ। এ খবরটা শুনে কেউ মনে করতে পারে 'কথাটা সম্পূর্ণ সত্য', কেউ মনে করতে পারে 'কথাটা পুরাপুরিই মিথ্যা' এবং কেউ মনে করতে পারে 'কথাটা সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে।' এবার খবরটা শোনার পর কার কিরূপ বিশ্বাস হল তা বুঝার উপায় কি হবে? এটা বুঝার উপায় অত্যন্ত সহজ। অর্থাৎ যে পুরাপুরিই বিশ্বাস করবে তার চলার গতি সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে যাবে। সে আর সিনেমার দিকে অগ্রসর হবে না, সে তৎক্ষণাৎ ছুটবে ডাক্তার বাড়ী। আর যে পুরাপুরিই মিথ্যা মনে করবে সে তার চলার গতি পরিবর্তন করবে না। সে সিনেমার দিকেই ছুটবে। আর যার মনে সন্দেহ হবে তাকে ঐ দুই ব্যক্তির যে সঙ্গে নেয়ার চেষ্টা করবে সেই সঙ্গে নিতে পারবে। পরকালের প্রতি কার কিরূপ বিশ্বাস তা বুঝারও ঐ একই পন্থা। অর্থাৎ যে বিশ্বাস করবে তার জীবন-যাপনের গতিধারা সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হবে এবং তার যাবতীয় কার্যকলাপ হবে পরকাল বিশ্বাসের সংগে সংগতিপূর্ণ। আর যার বিশ্বাস হবে সম্পূর্ণই উল্টা তার অবস্থা হবে সম্পূর্ণই পূর্ববৎ। অর্থাৎ তার জীবনের চলার পথের কোন পরিবর্তন আসবে না। আর যার মনে সন্দেহ বা অস্পষ্ট ধারণা হবে তাকে বেঈমনরা চেষ্টা করলে পুরা বেঈমান বানাতে পারবে আর ঈমানদাররা চেষ্টা করলে পুরা ঈমানদার বানাতে পারবে।

www.pathagar.com

ঈমানের ১ নং কালেমা

ঈমানে মুফাচ্ছাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ
تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَالْمَوْتِ

আমান্‌তু বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসূলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তা'য়ালা ওয়াল বায়াছে বা'দাল মাওত। অর্থাৎ —

"আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের ও পরকালের প্রতি, তাকদীরের ভাল মন্দ আল্লাহ থেকে এ কথার প্রতি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।"

ঈমানের এ সাতটি বিষয়বস্তুকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে ক্রমানুসারে সাজাতে পারি ঃ

১। আল্লাহর প্রতি।

২। তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি।

৩। তাঁর কেতাবসমূহের প্রতি।

৪। তাঁর রাসূলগণের প্রতি।

৫। পরকালের প্রতি।

৬। তাকদীরের প্রতি এবং

৭। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

এই ৭টি বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা ও ব্যাখ্যা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল ঃ

www.pathagar.com

১। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ঃ আমরা যারা মুসলমান তারা বিনা যুক্তিতেই আল্লাহকে বিশ্বাস করি। তবুও এটা যেহেতু বিজ্ঞানের যুগ আর এ যুগের কিছু লোকের ধারণা যে পৃথিবীর আদি কালটা ছিল বর্বর যুগ, আর মাঝে ছিল ধর্মের যুগ এবং বর্তমান যুগটা হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ লেখাও আমার চোখে পড়েছে, যাতে লেখা রয়েছে মধ্যযুগ বা ধর্মের যুগে যেমন তার পূর্বেকার বর্বরতা চলতে পারেনি। তেমন বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম চলতে পারে না। এ ছাড়াও আমাদের স্কুল-কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে যখন শিখান হচ্ছে যে আমরা এক সময় ব্যাঙ ছিলাম পরে বানর ছিলাম তারপর বন মানুষের পর্যায় পার হয়ে মানুষ হয়ে পড়েছি। অর্থাৎ আমরা আদমের আওলাদ নই, আমরা বানরের আওলাদ। এর দ্বারা প্রকারান্তরে আমাদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যিনি বলেছেন আমরা আদমের আওলাদ তিনি এক যুক্তি বিরোধী কথা বলেছেন কাজেই তা মিথ্যা এবং যিনি তা বলেছেন তিনিও মিথ্যুক। আর যিনি বলেছেন আমরা বানরের আওলাদ তিনি এক বৈজ্ঞানিক সত্য তথ্য উদ্ধার করেছেন, কাজেই তার কথাই ঠিক। এরূপ ভুল ধারণা দেয়া হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে। ফলে শিক্ষিতদের একটা শ্রেণীর মগজে আল্লাহ বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে। এ ফাটল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আমি একটা মাত্র যুক্তি পেশ করব যাতে নাস্তিকদরে নাস্তিকতাবাদী চিন্তায় ফাটল ধরবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস মজবুত হবে। যুক্তি হচ্ছে এই যে, যারা বলে সূর্য্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি আর পৃথিবীর এক কোষা প্রাণী থেকে মানুষ সৃষ্টি। তাদের নিকট প্রশ্ন, সূর্য থেকে তো পৃথিবী সৃষ্টি হলো কিন্তু সূর্য তৈরী হলো কোত্থেকে? অর্থাৎ বিবর্তনবাদের থিওরীতে বলে একটা থেকে আরেকটা কি করে সৃষ্টি হয় তার ধারা। কিন্তু প্রথমটার বা First cause এর সৃষ্টি হল কি করে? এর কোন জবাব কেউ দিতে পারেনি। তাছাড়া পৃথিবীতে এমন কোথাও কি কিছু হতে দেখেছে কেউ যা বিনা পরিকল্পনায় হঠাৎ করে নতুন কিছু হয়ে পড়েছে ? বরং এ পর্যন্ত এইটাই বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে যে যা ব্যবহারযোগ্য তাই পরিকল্পিত সৃষ্টি। আর যা এক্সিডেন্টের ফলে সৃষ্টি হয় তা কখনও কারও ব্যবহারযোগ্য হয় না। অতএব, পৃথিবী যদি এক্সিডেন্টের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই পৃথিবী ব্যবহারযোগ্য হতে পারত না এবং এতে প্রাণীও সৃষ্টি হতে পারত না। কিন্তু এ পৃথিবী যেহেতু ব্যবহারযোগ্য তাই প্রমাণিত হলো যে এটা একটা পরিকল্পিত সৃষ্টি। এ পরিকল্পনাটা যাঁর—তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ।

www.pathagar.com

২। ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস ঃ আমরা দৃশ্যমান জগতে যেমন দেখি একটা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে এবং বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন দায়িত্বশীল রয়েছেন। ঠিক তেমনি আল্লাহর অদৃশ্যমান জগতেও বহু বিভাগ রয়েছে যেগুলির জন্যে আল্লাহর বহু দায়িত্বশীল ফেরেশতা রয়েছেন যাদের পৃথক পৃথক বিভাগ রয়েছে আর তাদের সংখ্যাও কম নয়। তাদের কারও উপর রয়েছে মেঘ চালনার দায়িত্ব। কারও উপরে রয়েছে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ রেকর্ড করার দায়িত্ব। কারও উপরে রয়েছে মানুষকে আকস্মিক দুর্ঘটনার হাত থেকে হেফাজতের দায়িত্ব। এভাবে অদৃশ্যমান জগতে হাজারও বিভাগ রয়েছে যেগুলির উপরে দায়িত্বশীলও রয়েছেন। উপরে কিছু ফেরেশতাদের দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যা আমরা হর হামেশাই শুনে আসছি কিন্তু আরও কিছু ফেরেশতা এমন কিছু দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন যার প্রচার খুব কম। সেগুলি সম্পর্কেও আমি সামান্য কিছু অভাষ দিচ্ছি। এক একটা মানুষের পিছনেও যেমন তাকে হেফাজতের জন্যে কিছু ফেরেশতা রয়েছে আকাশের প্রত্যেকটি গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলী, চাঁদ-সূর্য্য ও পৃথিবী এদের প্রত্যেকটির পিছনেও বহু ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন, যারা এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যেমন পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টার কাছাকাছি সময়ে একবার ঘুরে আসে, এতে কোটি কোটি বছর ধরে এক সেকেণ্ডেরও কম বেশী হচ্ছে না, এর কারণ এই যে— এসব ব্যাপারে যেন এক বিন্দু পরিমাণও কম বেশী না হয় তা দেখার ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে আল্লাহর নিয়োজিত ফেরেশতা রয়েছেন। এমনকি সূর্য্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণের সময়ও যেন এক সেকেণ্ডেরও কম বেশী না হয় তা দেখার জন্যেও ফেরেশতা রয়েছেন। তাছাড়া বায়ুর মধ্যে যে সব গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে সেগুলি একটা নির্দিষ্ট ভাগ মুতাবিক রয়েছে। যে ভাগের কম বেশী হলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এমন বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে যে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা যেন না হয় সেজন্যে বায়ুমণ্ডলের যাবতীয় গ্যাসীয় পদার্থগুলিকেও একটা নির্দিষ্ট ভাগ মত রাখা ও তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যেও ফেরেশতা রয়েছেন। তাছাড়া এমন কিছু ব্যাপার রয়েছে যা নিয়ে মানুষ চিন্তা করলে অবশ্যই বুঝতে পারে যে এর জন্যে অবশ্যই কোন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যেমন মানুষের নাক থেকে বেরিয়ে আসা দুষিত গ্যাসীয় পদার্থকে বিশুদ্ধ করে মানুষের পুনঃনিশ্বাস গ্রহণের উপযোগী করে তুলতে ঐ গ্যাসীয় পদার্থকে সংগে সংগে গাছের পাতায় পৌঁছে দেয়া এবং সেখান থেকে বিশুদ্ধ করে

www.pathagar.com

নিয়ে ঐ বায়ুকে পুনরায় মানুষের নাক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া এর জন্যও ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। এভাবে একটা ফুলের পুংকেশরের পরাগ রেণুকে গর্ভকোষে ডিম্বকের সংগে মিলিয়ে দেয়া, যার মাধ্যমে একটা ফল তৈরী হতে পারে এ সবের জন্যেও আল্লাহর ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। এ ছাড়াও এমন বহু ব্যাপারে আল্লাহর ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে যা শুনলে মানুষকে অবাক হতে হবে কিন্তু বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি হবে বলে এ সম্পর্কে একটা আভাষ দিয়ে এখানেই শেষ করছি। তাছাড়া ফেরেশতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করতে হলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার, নইলে ফেরেশতাদের কার্যকলাপ যতই শুনা যাবে ততই অদ্ভূত লাগবে।

৩। কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাসঃ

৪। রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসঃ

আল্লাহ যুগে যুগে মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে নবী পাঠিয়েছেন এবং নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ আসমানী কিতাব দিয়েছেন।

কিতাব ও নবী রাসূলের যৌক্তিকতা

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে বিশেষ করে জীবন ধারণের জন্যে মানুষকে দিয়েছেন সহজাত প্রবৃত্তি বা নফ্‌স। এ প্রবৃত্তিগুলি লাগামহীনভাবে প্রবৃত্তির চরিতার্থ চায়। যেমন খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তি খেতে চায়, সে হালাল হারামের ধার ধারে না। এই নফসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন বিবেক। কিন্তু এক একজনের বিবেকের রায় এক এক প্রকার হয় এমনকি একই ব্যক্তির বিবেক একই বিষয় সম্পর্কে এক এক সময় এক এক প্রকার অর্থাৎ বিপরীত মুখী হয়ে থাকে। যেমন কারও বিবেকের রায় হচ্ছে সম্পদে ব্যক্তির মালিকানা থাকতে হবে এবং সে মালিকানা নিরঙ্কুশ হতে হবে। অন্যের বিবেক বলছে সম্পদে ব্যক্তির মালিকানা থাকা সম্পূর্ণ অনুচিত। আবার একই ব্যক্তির বিবেক একবার বলছে সুদভিত্তিক অর্থ বিনিয়োগ ব্যবস্থাই সর্বাধিক নিরাপদ ও লাভজনক ব্যবস্থা। পুনরায় সেই একই ব্যক্তি এটাকে জুলুমের হাতিয়ার বলে রায় দিচ্ছে। এইবার বলুন এই ধরনের স্থান সমূহে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যে কোন বিবেক কোন রায়টাকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য রায় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন ? আপনার রায় না আমার রায় ? আমার রায় আপনি মানবেন কেন ? এবং আপনার রায়ই বা আমি মানব কেন ? এভাবে বর্তমান বিশ্বের ৫০০

www.pathagar.com

কোটি মানুষের ৫০০ কোটি রায়ের কোনটা বা কোন বিশেষ ব্যক্তির রায়টা গোটা মানব জাতির জন্যে গ্রহণযোগ্য হবে ?

এখানে মানুষকে এমন এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে যার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার মত কোন সামাধানই খুঁজে পাওয়া যাবেনা । অথচ এর সামাধান হতেই হবে নইলে দুনিয়ার সমাজই অচল হয়ে যাবে। এই ধরনের হাজারও সমস্যা দেখা দেবে যার সমাধান মিলবে না, ফলে মানব সমাজ পশু সমাজে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। এই সব সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্যেই নবী রাসূল ও আসমানী কিতাবের প্রয়োজন। এই বার দেখুন নবী রাসূলগণের মাধ্যমে আমরা যে সব সমাধান পেয়েছি এবং তার যেগুলি সাধারণভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি মেনে নিয়েছে, ঐ সমাধানগুলি যদি মানুষের রায় মুতাবিক করা হত তাহলে চিন্তা করুন সমাজের রূপ চেহারা কিরূপ হত। যেমন বিবাহ সংক্রান্ত যে ব্যবস্থা সমাজে চালু রয়েছে; যা পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি সমানভাবে মেনে নিয়েছে এটা যদি নবী রাসূলগণের মাধ্যমে পাওয়া খোদায়ী বিধান মুতাবিক না হয়ে ধরে নিন কোন দেশের কোন নেতার বিবেকের রায় মুতাবিক হত আর সে নেতা ধরে নিন যদি মাও সেতুং হতেন— যিনি মনে করেন বিবাহ হচ্ছে নারী নির্যাতনের এক অপকৌশল। তার বিবেকের রায় যদি পৃথিবী একচেটিয়া ভাবে মেনে নিত তাহলে মানব সমাজ কি সমাজ থাকত? নাকি পশু সমাজে পরিণত হত? এই ধরনের লক্ষ লক্ষ কারণে নবী রাসূল (স) ও আসমানী কিতাবের প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হতে পারে আল কুরআন যে সত্যই আল্লাহর বাণী তার প্রমাণ কি? আমি এ প্রশ্নেরও একটা সংক্ষিপ্ত জাবাব পেশ করছি— এবং এখানে ছোট ছোট মাত্র ৩টি যুক্তি দিচ্ছি। যেমন—

১। দুনিয়ার এমন কোন লেখকের জন্ম হয়নি যিনি একবার লিখেছেন আর তা পুনরায় সংশোধন করা লাগেনি। অথচ রাসূল (স) একবার মুখ দিয়ে বলেছেন তা আর ২য় বার সংশোধন করা হয়নি কিন্তু তার মধ্যে ব্যাকরণের সামান্যতম কোন একটি ভুলও কেউ বের করতে পারেনি। এটা কি একটা মানুষের পক্ষে সম্ভব?

২। আল কুরআনে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা নবী (স) এর মুখ থেকে পৃথিবী পেয়েছে ১৪শত বৎসর পূর্বে। আর তার সত্যতা প্রমাণ হচ্ছে আজ বিংশ শতাব্দীতে। এটা আল্লাহর কথা ছাড়া সম্ভব হতে পারে?

৩। আল কুরআনের অক্ষর, শব্দ, সূরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে একটা হিসাব। হিসাবটাও এমন যা কম্পিউটার মেশিনে ধরা পড়ার মত। যেমন

www.pathagar.com

গ্রন্থখানার নাম 'আল কুরআন'। এর মধ্যে আরবী অক্ষর রয়েছে ৬টি। এই কুরআন শুরু হয়েছে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' দ্বারা। যার মধ্যে অক্ষর রয়েছে ১৯টি আর ৬×১৯= ১১৪ এই ১১৪টিই হচ্ছে আল কুরআনের সূরার সংখ্যা। আর ১১৪টিই বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম রয়েছে গোটা কুরআনের মধ্যে । এই ধরনের বহু মিল রয়েছে গোটা কুরআনের মধ্যে যা হিসাব করে কথা বলা বা বই লেখা দুনিয়ার একটি মানুষের জন্যেও সম্ভব নয়। এ আলোচনা থেকে নবী ও কিতাবের যৌক্তিকতা অবশ্যই প্রমাণিত হল। এবার পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাই। দেখুন পূর্বেই বলেছিলাম মানুষ বেঁচে থাকার সুবিধার্থে আল্লাহ দিয়েছেন মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি। আর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে আল্লাহ দিয়েছেন বিবেক। আর বিবেকের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে তাকে নির্ভুল পথে পরিচালনা করার জন্যেই নবী রাসূলগণের (সা) মাধ্যেমে আল্লাহ দিয়েছেন শরীয়তের জ্ঞান বা ওহির জ্ঞান। তাহলে প্রমাণ হল নফসকে থাকতে হবে বিবেকের অধীন আর বিবেককে থাকতে হবে অহির বা আল্লাহর দেয়া শরীয়তের অধীন। তবেই তার জীবন চলবে সঠিক পথে নইলে বিবেক যদি নফসের অধীন হয়ে পড়ে তবে তার ইহকালও শেষ হবে পরকালও শেষ হবে। কাজেই সঙ্গত কারণেই প্রয়োজন ছিল নবী রাসূলগণের মাধ্যমে আসমানী কিতাব পাওয়ার এবং সেই কিতাব থেকে পাওয়া জ্ঞানের মাধ্যমে বিবেকের নিয়ন্ত্রণ করা। তাহলে পরিস্কার ভাবে বুঝা গেল কিতাব ও রাসূল মানুষের প্রয়োজনেই আল্লাহ দিয়েছেন যা অবিশ্বাস করার কোন যুক্তি নেই।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার মর্যাদা

'মানুষ যে যত বেশী দামী তার কথাও তত বেশী দামী'—এ কথাটাকে প্রত্যেক মানুষ যেমন একবাক্যে স্বীকার করে তেমন এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে আল্লাহ যেমন আকবার বা সব চাইতে বড় তেমন তার কথা ও হুকুমও আকবার বা সব চাইতে বড়। এই সহজ ও সরল বুঝটা যখন কোন মানুষের মগজে বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন তার মাথায় কুড়াল মাড়লেও আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টিকারী কোন হুকুম সে মানতে পারে না। অতঃপর বাস্তব ক্ষেত্রে যারা আল্লাহকে সব চাইতে বড় মনে করতে পারে তারা সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মেনে নিতে পারে যে আল্লাহ পাক নেহায়েত অনুগ্রহ করে আমাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্যে যে সব নবী রাসূল পাঠিয়েছেন বিশেষ করে আমাদের যিনি শেষ

www.pathagar.com

নবী তিনি যেহেতু মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কাজেই তার কথাও পৃথিবীর যে কোন যুগের যে কোন ব্যক্তির কথার চাইতেও বেশী দামী এতটুকু সহজ সরল বুঝও যে মানুষটির মধ্যে সৃষ্টি হবে সে কিছুতেই নবীর (স) কথার সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে এমন কোন কথা— তা সে যত বড় জাদরেল ব্যক্তিরই কথা হোক না কেন— সে তা মানতে পারে না। অর্থাৎ যারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) কে সত্যিকার অর্থে মানে তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথকেই একমাত্র কল্যাণকর পথ হিসেবে মেনে নেয় এবং আল্লাহ বিরোধী কোন কথাই তারা যেমন মানতে পারে না তেমন তা তারা বরদাস্তও করতে পারে না।

৫। পরকালের প্রতি বিশ্বাস ঃ পরকাল হতে হবে মানুষের প্রয়োজনেই। মানুষের মনের মৌলিক আকাংখা পুরণ করাই রব হিসেবে আল্লাহর দায়িত্ব। এই চাহিদা পূরণের জন্যে আল্লাহ যেমন মায়ের স্তনে দুধ দিয়েছেন, গাছে ফল দিয়েছেন, আকাশে মেঘ দিয়েছেন, আকাশে চাঁদ সূর্য দিয়েছেন। এ সবও যেমন মানুষের প্রয়োজনে দিয়েছেন তেমন মানুষের প্রয়োজনেই পরকাল দিতে হবে, তাই আল্লাহ মানুষকে পরকাল দিবেন। মানুষের মনের মৌলিক আকাঙ্খা হচ্ছে ভাল কাজের ভাল ফল লাভ ও মন্দ কাজের মন্দ ফল লাভ। মানুষের মনের এই মৌলিক দাবী পূরণের জন্যে মানুষকে এমন একটা জীবন দিতে হবে যে জীবনে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোরণ করে যারা মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে পুড়িয়ে মারল তাদের যেন লক্ষ লক্ষ বার পুরিয়ে মারা যায় তবুও যেন তারা না মরে এরূপ একটা লম্বা জীবন পাওয়ার মত একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। আর যারা মাহামূল্যবান জীবন বিসর্জন দিয়েও সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্যে জীবনে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন তাদেরও এমন একটা লম্বা জীবন দেয়া দরকার যেন তারাও তাদের ন্যায্য পাওনা পুরস্কার ভোগ করতে পারেন। মানুষের এই মৌলিক দাবী পূরণের জন্যে যে ভিন্ন পদ্ধতির নতুন পৃথিবী হওয়া উচিৎ সেইটাই হচ্ছে পরকাল । কাজেই এটা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার।

৬। তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসঃ তাকদীরের ভাল মন্দ তো আল্লাহর হাতে থাকতেই হবে। নইলে আল্লাহকে মানুষ আল্লাহ বলে মানবেই না। কাজেই তা আল্লাহর হাতেই থাকতে হবে। এইটাই যুক্তি।

৭। পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস ঃ পরকালে বিশ্বাস আর পুনরুত্থানে বিশ্বাস মূলতঃ একে অপরের পরিপূরক বিশ্বাস। শেষ বিচার বিশ্বাস করলে এটা মানতেই হবে যে পুনরায় জীবিত না হলে সে বিচারের কোন অর্থই হয় না।

www.pathagar.com

২নং ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ
وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ

"আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমায়িহি ওয়া সিফাতিহি ওয়া কাবিলতু জামীয়া আহকামিহি ওয়া আরকানিহি।"

আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তার গুণ বাচক নামের মধ্যে তার যে গুণ ক্ষমতা ও অধিকারের পরিচয় রয়েছে সেই সব কিছু সহকারে এবং তাঁর সমস্ত আইন কানুন এবং আইনের মূলনীতিসমূহ মেনে নিলাম।

অর্থাৎ আমি আল্লাহকে— তাঁর নিরানব্বইটা গুণবাচক নামের মধ্যে তাঁর যে গুণের পরিচয় পাওয়া যায় সেই গুণ সহকারেই বিশ্বাস করলাম এবং তার যত বিধিবিধান ও আইন কানুন রয়েছে তা গ্রহণ করলাম বা মেনে নিলাম।

কথা ক'টা যদিও খুব কম কিন্তু এর অর্থ কম নয়; বহু । এর মধ্যে বলা হয়েছে আল্লাহর গুণবাচক নামগুলির মধ্যে যেসব গুণের কথা রয়েছে সেই সব গুণ সহকারে আল্লাহকে মানি। কিন্তু আমরা কয়জন আল্লাহর সব ক'টা নাম জানি আর কয়জন তার অর্থ জানি এবং কয়জন জানি যে আল্লাহর নামের অর্থ জানার প্রয়োজনটা কি? এ ছাড়া এ কালেমার শেষাংশে বলা হয়েছে আল্লাহর আইন কানুন সব মেনে নিলাম। এ কথাগুলি কি শুধু মুখেই বলি না মন থেকেও বলি তা কি কেউ আমরা হিসাব করে দেখেছি? আমরা তো মুখে বললাম "আল্লাহর আইন-কানুন মেনে নিলাম", এর অর্থ আমরা আল্লাহকে কি বুঝাতে চাই? আমরা কি এই বুঝাতে চাই যে আল্লাহ তোমার নামাযের আইন মানলাম কিন্তু যাকাতের আইন মানলাম না, কারণ তাতে পকেট থেকে পয়সা বের করতে হয়। আর আল্লাহ তোমার রোযার আইন মানলাম কিন্তু চোরের হাত কাটা আইন মানলাম না কারণ তাতে নিজের বা নিজের আপনজনের হাতকাটা যাওয়ার ভয় রয়েছে। আর মোটামুটিভাবে মসজিদে বসে যা যা মানা যায় তাই মানলাম আর কোট কাচারীতে যা তোমার আইন তা মানা যাবে না কারণ তাতে

www.pathagar.com

স্বার্থ উদ্ধারের ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। এইটাই কি "কাবিলতু জামিয়া আহকামিহি ওয়া আরকানিহি" বা "তোমার সমস্ত আইন কানুন ও বিধি বিধান মেনে নিলাম" এর অর্থ? আমরা দস্তুর মত কোট কাচারীর আইন, শিক্ষাগারের নিয়ম-নিতি, ব্যাংক বীমার আইন কানুন, বিচার ফায়সালার বিধি বিধান ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে নির্বিবাদে মানুষের আইনকে মেনে নিয়েছি অথচ আল্লাহকে বলি "কাবিলতু জামিয়া আহকামিহি ওয়া আরকানিহি।" এখানে একটা কথা আমি বুঝতে পারিনা যে, আমরা যা বাস্তবে করি তার বিপরীত কথা যখন আল্লাহকে বলি তখন আমরা আল্লাহকে কি মনে করি? আমরা কি মনে করি যে আল্লাহর কোন বোধ-সোদ নেই? (নাউজুবিল্লাহ) অর্থাৎ আমরা বাস্তব জীবনে যা-ই করিনা কেন আল্লাহ কি আর অতসব খেয়াল করবেন? বরং আল্লাহকে যদি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলে দেই যে, "কাবিলতু জামিয়া আহকামিহি ওয়া আরকানিহি" বা "তোমার যাবতীয় আইন কানুন ও বিধি বিধান মেনে নিয়েছি" তাতেই আল্লাহ খুশী হয়ে যাবেন। তা ছাড়া যদি অন্যান্য দিকের কাজকর্মগুলি আল্লাহর হুকুম মত করি যা সহজে করা যায় তাতে কি আল্লাহকে ভোলান যাবে না? আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ব্যবহারের ব্যাপারে এক বিশেষ চরিত্রের যেমন কিছু লোক পাওয়া যায় আমরা যেন আল্লাহর সঙ্গেও সেইরূপ ব বহার করতে চাই। যেমন নির্বাচনের সময় প্রার্থী যিনিই আসেন তাকেই অনেকে বলেন যে আমি আপনারই কর্মী। তারা এক প্রার্থীর নিকট থেকে তাঁরই কাজ করবে বলে সেন্টার খরচ বাবদ হাজার খানেক টাকা নেয় আর বাস্তবে ভোট দেয় অন্য আরেক জনকে।

মনে করে যার নিকট থেকে হাজার খানেক টাকা নিয়েছি তিনি তো আর টের পাননি যে আমি কোন দিকে কাজ করেছি। তাকে যা বলে দিয়েছি (যে আমি আপনারই ওয়ার্কার) তিনি তাই বিশ্বাস করে নিয়েছেন। আমরা যেন আল্লাহকেও সেইরূপ মনে করে নিয়েছি (নাউজুবিল্লাহ)। তাই আল্লাহকে শুনিয়ে দেই যে আল্লাহ আমরা তোমারই আইন মেনে নিয়েছি অথচ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আল্লাহর কোন আইন মানি না। এখানে কি আমরা মনে করি যে, আল্লাহ সব সময় মসজিদেই পড়ে থাকেন, কাজেই মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের ব্যাপারে কোন প্রকার ভুল ত্রুটি হলে আর উপায় নেই, কারণ আল্লাহ তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে যাচ্ছেন, কিন্তু তিনি কি আর হাটে বাজারে কেনা বেচার সময় ও অফিস আদালতে বসে কাজ কামের সময় মানুষ কি করে না করে অতসব আর দেখে বেড়ান? কাজেই ওসব জায়গায় বসে যা খুশী তা করিনা

www.pathagar.com

কেন, তা আল্লাহ দেখবেন না। আমরা সোজা মসজিদে বসে বলে দেব আমানতু বিল্লাহ .....। আল্লাহ তাতেই খুশী হয়ে যাবেন। এখানে কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে আমরা প্রকৃতই আল্লাহর সব আইনই মানি কিন্তু যে সব জায়গায় আমাদের ক্ষমতার বাইরে আইন রয়েছে সেখানে যেহেতু আমাদের কিছু করার নেই তাই সে সব ক্ষেত্রে আমরা চুপ থাকি। এটা যে একটা বিভ্রান্তিকর বুঝ তা পরবর্তী আলোচনায় আশা করি ধরা পড়বে। যেমন হাদিস ৩ প্রকার যথাঃ—

১। কওলী—নবীর (স) মুখের কথা।

২। ফে'লী—নবী (স) এর কাজ যা তিনি নিজে করেছেন।

৩। তাকরিরি—নবী (স) এর সমর্থিত কাজ। অর্থাৎ নবী (স) এর সামনে যে সব কাজ হয়েছে, তিনি দেখেছেন কিন্তু কোন প্রতিবাদ করেননি সেগুলিও লেখা হয়েছে। সেগুলিই হচ্ছে হাদিসে তাকরিরি।

যেমন- হাদীসে আছে ঃ—

عَنْ اِبْنِ اَبِىْ عَوْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ كُنَّا نَاْكُلُ مَعَهُ جَرَدًا ـ

(আন ইবনে আবি আওফা রাজিয়াল্লাহ আনহু কালা গাজাওনা মা'আ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামা ছাব 'আ গাজাওয়াতিন কুন্না না কুলু মা' আহু জারাদা) হযরত আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন আমরা সাতটা যুদ্ধে হুজুরের (স) সঙ্গে ছিলাম তখন আমরা ফড়িং জাতীয় টিড্ডি চড়ুই খেতাম। এটা হাদিসে তাকরিরি। অর্থাৎ বুঝা গেল—যা-ই হুজুর (স) এর সামনে হয়েছে অথচ তিনি তার প্রতিবাদ করেননি, তা সবই ইসলামে বৈধ। কিন্তু যেটাই ইসলামে অবৈধ তার এমন একটি কাজও হয়নি যা হুজুর (স) দেখেছেন কিন্তু প্রতিবাদ করেননি। তাহলে প্রমাণ হল যে, হুজুর (স) এর যা চরিত্র ছিল ঐটাই হচ্ছে ইসলামী চরিত্র। আর ইসলামী চরিত্রই হচ্ছে এই যে, যা কিছু ইসলাম বিরোধী তা চোখে দেখলেই অন্ততঃপক্ষে তার প্রতিবাদ করতে হবে আর যদি প্রতিবাদ না করি তাহলেই প্রমাণ হয় যে তা সমর্থন করি। মনে মনে সমর্থন বা অসমর্থনের কোন মূল্য ইসলামী সমাজ দেয় না। যেমন কেউ মনে মনে কালেমা পড়ল কিন্তু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল না তাকে যেমন মুসলমান

www.pathagar.com

বলে মানা যাবে না, কেউ যদি মনে মনে বিয়ে করে তবে বিয়ের যেমন কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই তেমনই কেউ মনে মনে ইসলাম বিরোধী কাজকে না মানলেও যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন বাস্তব প্রমাণ হয় না। এই জন্যেই হুজুর (স)-এর সামনে এমন একটি কাজও হয়নি যা ইসলাম বিরোধী কাজ ছিল অথচ তা তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেননি । এখানে লক্ষনীয় যে আমরা অনেকে বিরোধিতা এড়ানোর জন্যে বলি "আগে মানুষের মধ্যে ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টি করা হোক, তারপর আপছে সমাজ সংশোধন হয়ে যাবে।" যদিও আমাদের অনেকের বদ্ধমূল ধারণা কিন্তু হুজুর (স) এর সমর্থনে একটি বাক্যও কোনদিন মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেননি। তা যদি করতেন তা হলে হাদিসে তাকরিরি নামে কোন হাদিস হতেই পারত না। অর্থাৎ নবী (স) যদি মনে করতেন যে ইসলাম বিরোধী কাজের প্রতিবাদ এখনই দরকার নেই, পূর্বে মানুষের ঈমানকে মজবুত করে নেই, পরে প্রতিবাদ করব। তাহলে অবস্থা দাঁড়াত এই যে তিনি যখন দেখতেন যে ব্যাংকে সুদি কারবার রয়েছে তখন যদি মনে করতেন যে ঠিক আছে এখন কিছু বলব না, ওটা পরে আপছে উঠে যাবে তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গে লেখা হত যে নবী (স) যেহেতু সুদ দেখেও তার প্রতিবাদ করেন নি, কাজেই ওটা ইসলামে জায়েয। ফলে বহু ইসলাম বিরোধী কাজ জায়েয হয়ে যেত অথবা তাকরিরি হাদিস নামে হাদিস রাখাই যেত না। এ আলোচনায় স্পষ্ট প্রমাণিত হল নবী (স) অন্যায় দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করেছেন, যদিও আমরা তা করি না।

আল্লাহর গুণবাচক নামকে কিভাবে গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কে হাদিস

إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ اَحْصٰى هَا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔

"ইন্না লিল্লাহি তিসআতাও' ওয়া তিসয়িনা ইছমান মিআতান গাইরা ওয়াহেদাতিন মান আহছাহা দাখালাল জান্নাতা"— অর্থাৎ আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, যারা এ নামগুলিকে পূর্ণরূপে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করতে পারবে তারাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। এখানে 'আহছা' শব্দ থেকে বুঝান হয়েছে আল্লাহর

www.pathagar.com

নামগুলির অর্থ জানবে ও বাস্তবে তা গ্রহণ ও সংরক্ষণ করবে। গ্রহণ ও সংরক্ষণ এর অর্থও দু'টি—

(১) আল্লাহর প্রত্যেকটি নামের সংগে নিজের সম্পর্ক দৃঢ় করা। একে বলে (তায়াল্লুক বিল্লাহ) বা আল্লাহর সংগে সম্পর্ক দৃঢ় করা।

(২) আল্লাহর নামের মধ্যে আল্লাহর যে গুণের পরিচয় পাওয়া যায় সেই গুণের চরিত্র নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্যে চেষ্টা করা। একে বলে (তাখাল্লোক বিল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলীর অনুরূপ করে নিজের চরিত্র গঠন করা।

অর্থাৎ ঈমানে মুজমাল নামক কালেমার মধ্যে আমরা যে বললাম, "আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমায়িহি ওয়া ছিফাতিহি" বা আল্লাহর গুণবাচক নামের মধ্যে আল্লাহর যে গুণের পরিচয় পেয়েছি সেই পরিচয় বা সেই গুণাবলী সহকারেই আল্লাহকে মানলাম। এর অর্থ হলঃ

(১) আল্লাহর প্রত্যেকটি গুণের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং

(২) আল্লাহর গুণের অনুরূপ করে নিজের চরিত্র গঠন করা।

এবার আসুন আল্লাহর গুণবাচক নামগুলিকে বুঝার চেষ্টা করি এবং তদনুরূপ (ক) আল্লাহর সংগে সম্পর্ক দৃঢ় করি ও (খ) সেই মুতাবিক চরিত্র গঠন করি।

আল্লাহর নাম, অর্থ ও ব্যাখ্যা

১। اَللّٰهُ — **আল্লাহ** ঃ (ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ। এটা আল্লাহ পাকের যা-তি নাম। এর একটা শাব্দিক অর্থও রয়েছে, যেমন— পূর্ব যামানার কিছু মুহাক্কিক বলেছেন আল + ইলাহ = আল্লাহ। ইলাহ অর্থ সার্বভৌমত্বের অধিকারী, আর আল শব্দ দ্বারা সেটাকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ শব্দের অর্থ দাঁড়াল সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র ও একচ্ছত্র অধিকারী। তাহলে এ নামের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় করতে হলে একমাত্র আল্লাহকেই সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করতে হবে এবং আমাদের বাস্তব কাজের সঙ্গে তার এইরূপ মিল রাখতে হবে যে আল্লাহর রাজত্বের মধ্যে আর কারও প্রাধান্য মানব না। সর্বদাই আল্লাহর নাম স্মরণ করব, জিকির করব এবং সর্বদাই এই অনুভূতি নিজের মধ্যে জাগ্রত রাখব যে আল্লাহর রাজত্বে আর কারও মাতুব্বরি নাই।

www.pathagar.com

খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ এ নামের বিশ্বাস থেকে এমন চরিত্র গঠন করতে হবে যেন আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মধ্যে অন্য কারও সার্বভৌমত্বের দাবী বা যে কোন পন্থায় মানুষের চোখে ধূলা দিয়ে তার কোন প্রকার প্রয়োগ আদৌ যেন বরদাস্ত না করি।

২। اَلرَّحْمٰنُ — আর রহমানু ঃ বা অত্যন্ত দয়ালু।

৩। اَلرَّحِيْمُ — আর রাহীমু ঃ এই একই অর্থবোধক শব্দ।

ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণঃ নিজের প্রতি আল্লাহকেই একমাত্র পরমতাদা ও দায়ালু হিসাবে মেনে নেওয়া। এরূপ মানতে পারলে মনে কখনও এমন খেয়াল স্থান পাবে না যে বিপদকালে চীন, আমেরিকা বা ভারত রাশিয়ার দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে। সে সর্বদাই আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভর করবে।

খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ আল্লাহ যেমন আমার প্রতি পরমদাতা ও দয়ালু তেমন আমার চরিত্রের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা থাকবে না, আমিও আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দাতা ও দয়ালু হব।

৪। اَلْمَلِكُ — আল মালিকু ঃ আল্লাহই একমাত্র সর্বেসর্বা বাদশাহ।

ক) সম্পর্ক স্থাপন ও দৃঢ়করণ ঃ মানুষ যেমন রাষ্ট্র প্রধানকে ভয় করে চলে এবং রাষ্ট্র প্রাধানের হুকুম অমান্য করাকে চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করে ঠিক তেমনই আমি যেহেতু অন্য কাউকে নয়, একমাত্র আল্লাহকেই বাদশাহ বলে মানি তখন আল্লাহর আইন মেনে চলাই হবে আমার বাস্তব জীবনের যাবতীয় আমল।

খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ বাদশার আনুগত্য ও দাসত্বই হবে চরিত্রের বিশেষ গুণ। এরপর ৫ম থেকে ১১শ নাম পর্যন্ত আল্লাহর এমন ৭টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে বলা হয়েছে আল্লাহ কি ধরনের গুণ সম্পন্ন বাদশাহ।

৫। اَلْقُدُّوْسُ — আল কুদ্দুসু ঃ যাবতীয় অন্যায়, জুলুম, নির্যাতন ও যে কোন প্রকার ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, এমন এক বাদশাহ আল্লাহ।

৬। اَلسَّلَامُ — আস্ সালামুঃ আল্লাহই শান্তিদানকারী বাদশাহ অর্থাৎ আল্লাহই এমন বাদশাহ যার আইনেই সমাজে শান্তি আসতে পারে অর্থাৎ

www.pathagar.com

আল্লাহর দেয়া সূর্য ছাড়া যেমন দিন হয় না তেমন আল্লাহর বাদশাহী না হ'লেও সমাজে সালাম বা শান্তি আসতে পারে না।

৭। اَلْمُؤْمِنُ — আল মু'মিনু ঃ নিরাপত্তাদানকারী বাদশাহ।

৮। اَلْمُهَيْمِنُ — আল মুহাইমিনু ঃ রক্ষণাবেক্ষণকারী বাদশাহ।

৯। اَلْعَزِيْزُ — আল আযিযু ঃ মহা সন্মানিত, মহা প্রভাবশালী ও মহা শক্তিধর বাদশাহ।

১০। اَلْجَبَّارُ — আল্ জাব্বারু ঃ যা খুশী তা করার মত শক্তিশালী বাদশাহ্।

১১। اَلْمُتَكَبِّرُ - আল্ মুতাকাব্বিরু ঃ সব রকম শক্তি ও গুণের বড়াই করার মত একমাত্র বাদশাহ।

ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণঃ আল্লাহকে উপরোক্ত শক্তি ও গুণের এক মাত্র অধিকারী বাদশাহ হিসাবে মেনে নিয়ে (আল্লাহর) প্রতি এমন ভয় পোষণ করতে হবে যেন অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিই সেই ধরণের ভয় ভীতি না থাকে এবং মনে এমন অবস্থা রাখতে হবে যে আমার বাদশার চাইতে আর কোন শক্তিধর বাদশাহ হ'তেই পারে না। কাজেই আমরা আমাদের সর্বোচ্চ শক্তিধর বাদশার যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ আনুগত্য করতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোন প্রকার ভয় নেই।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠনঃ যদি আল্লাহ কাউকে নেতৃত্ব বা বাদশাহী দান করেন তা'হলে তিনিও যেন নিরাপত্তাদানকারী, সংরক্ষণকারী ও ন্যায় বিচারক সুলভ চরিত্র গঠন করেন। আর তিনি যেন অশান্তির প্রবর্তক না হয়ে শান্তির প্রবর্তক হতে পারেন এবং তিনি যেন আল্লাহকে মূল বাদশাহ হিসাবে মেনে নিয়ে নিজেকে আল্লাহর খলিফা মনে করে আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করেন এবং যেন আল্লারই তাবেদার হ'য়ে চলার মত চরিত্র গঠন করেন।

১২। اَلْخَالِقُ — আল্ খালিকু ঃ দৃশ্যমান বস্তুসমূহের সৃষ্টিকর্তা।

www.pathagar.com

১৩। اَلْبَارِئُ — আল্ বারিয়ু ঃ রুহ্ এবং অদৃশ্যমান বস্তু সমূহের সৃষ্টিকর্তা।

১৪। اَلْمُصَوِّرُ আল্ মুসাওব্বিরু ঃ আল্লাহ আকার আকৃতি দানকারী।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ এই সব সৃষ্টির কারণে একমাত্র আল্লাহরই কৃতজ্ঞতা বা শোকর আদায় করা।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ আল্লাহর এই সব গুণ যে আল্লাহ ছাড়া কোন মানুষের মধ্যে নেই এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে মেজাজকে গড়ে তোলা। অর্থাৎ আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা হিসাবে মেনে নিয়ে সেই আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে জীবনকে গড়ে তোলার মত মেজাজ সৃষ্টি করা।

১৫। اَلْغَفَّارُ — আল্ গাফফারু ঃ আল্লাহ বহু বড় ক্ষমাকারী।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ আল্লাহ ক্ষমাকারী হিসাবে তিনি যদি গোনাহ মাফ না করেন তবে একটি মানুষও পরিত্রান পেতে পারবে না। অথচ আল্লাহ মানুষকে মাফ করেন এবং করবেন। এর জন্যে অহরহ আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা দরকার।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ আমাদের প্রত্যেকের যেমন ক্ষমার প্রয়োজন রয়েছে তেমন আমাদেরও উচিৎ মানুষকে ক্ষমা করা। যখন কেউ আপনার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করে ক্ষমা চাইবে তখন আপনাকে হিসাব করে দেখতে হবে এর চাইতে বড় অপরাধ আমি আল্লাহর প্রতি কখনও করেছি কিনা এবং সেই অপরাধ থেকে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুক আমি তা চাই কিনা। এটা যদি আপনি চান তবে আপনার চরিত্রে এমন গুণ থাকা উচিৎ যে, যে কোন প্রকার বড় অপরাধ যেন আপনি ক্ষমা করতে পারেন। নইলে শেষ বিচারের দিনে কোন অপরাধের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ যখন বলবেন যে তুমি আমার অমুক বান্দার অমুক অপরাধ ক্ষমা করনি। কাজেই আমি তোমার তার চাইতে বড় অপরাধ কেন ক্ষমা করব। সেদিন যেন লা জবাব না হতে হয় সেইরূপ হিসাব করেই নিজেকে ক্ষমাশীল হতে হবে। হ্যাঁ, তবে আপনার ক্ষমা যেন অন্যের জুলুমের পথ প্রশস্ত না করে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ক্ষমা করতে হবে।

www.pathagar.com

১৬। اَلْقَهَّارُ — আল কাহ্হারু ঃ প্রভাব বিস্তারকারী মহা শক্তিধর।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ মহা শক্তিধর হিসাবে তার ভয়ে সর্বদা ভীত থাকা যেন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই আমার দ্বারা না হয়ে যায়।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ আল্লাহ্ 'আল কাহ্হার' হিসাবে তার সৃষ্টির উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করেন তেমন কু-প্রবৃত্তি ও সামাজিক নীতি বিবর্জিত কার্যকলাপের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হয়ে তা দমন করার মত স্বভাব নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে।

১৭। اَلْوَهَّابُ — আল্ ওয়াহ্হাবু ঃ আল্লাহ অত্যন্ত বেশী দাতা।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ অত্যন্ত দাতা হিসাবে আল্লাহর বেশী বেশী শোকরিয়া আদায় করা।

১৮। اَلرَّزَّاقُ — আর রাযযাকু ঃ আল্লাহই একমাত্র রুজী দেনেওয়ালা।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণঃ রুজির ব্যাপারে আল্লাহর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে এবং আল্লাহর দেয়া হাত,পা, চোখ, কান, বিবেক, বুদ্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করে আল্লাহর দেখানো পথে হালাল রুজি উপার্জনের চেষ্টা করতে হবে।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ অর্থাৎ আল্লাহ যেমন আমাকে রুজি দেন তেমন আমার উপর যারা বির্ভরশীল তাদেরও রুজির জন্যে আমাকে সচেষ্ট হতে হবে।

১৯। اَلْفَتَّاحُ — আল ফাত্তাহু ঃ বন্ধ দরজা যিনি খুলে দেন অর্থাৎ বিদ্যা বুদ্ধি রুজি ও বিভিন্ন প্রকার লাভের দরজা যিনি খুলে দেন।

২০। اَلْعَلِيْمُ — আল আলীমু ঃ সর্বজ্ঞ বা যিনি সব কিছুই জানেন।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ সকল প্রকার অসুবিধার রুদ্ধ কারাগারের দ্বার উদঘাটন করে নিস্কৃতি দেন যিনি। যাবতীয় বিপদ মুছিবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে তারই মুখাপেক্ষী হব। যিনি সর্বজ্ঞ বা সবজান্তা। তার নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের জন্যে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে আর যেহেতু তিনি সবকিছু জানেন তাই নিজেকে সদা সতর্ক অবস্থায় রাখতে হবে যেন নিজের মধ্যে এমন কিছু প্রকাশ না পায় যা আল্লাহর দৃষ্টিতে দুষণীয়।

www.pathagar.com

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ যতদূর সম্ভব অন্যের মধ্যে জ্ঞান দান এবং অন্যান্যদের জন্যে বিভিন্ন প্রকার লাভজনক ব্যবস্থার দরজা খুলে দেয়া।

২১। اَلْقَابِضُ — আল ক্বাবিজু ঃ সংকীর্ণকারী ।

২২। اَلْبَاسِطُ — আল বাসিতু ঃ প্রশস্তকারী।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণঃ যে কোন ব্যাপারে যে কোন কিছুকে আল্লাহই সংকীর্ণ করতে পারেন ও করে থাকেন। আবার তিনি তা প্রশস্ত করতে পারেন ও করে থাকেন। কাজেই তারই প্রতি সদা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দোয়ার লিপ্ত থাকা, যেন তিনি সংকীর্ণ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে প্রশস্ত অবস্থা এনে দেন।

(খ) তদনুযায়ী চরিত্র গঠনঃ আল্লাহ যখন যে অবস্থায় রাখেন তা সহ্য করার মত ধৈর্য্যশীল হওয়া।

২৩। اَلْخَافِضُ — আল খাফিছু ঃ তিনিই অবনতি দানকারী।

২৪। اَلرَّافِعُ — আর রাফিয়ু ঃ তিনিই উন্নতি দানকারী।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ যেহেতু তাঁর হাতে উন্নতি অবনতি কাজেই তাঁরই নিকট সর্বদা অবনতির হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে উন্নতি লাভের জন্যে প্রার্থনা করতে থাকা এবং তাঁরই দেখানো পথে উন্নতি লাভের চেষ্টা করা।

(খ) তদনুযায়ী চরিত্র গঠন ঃ নিজে যেমন অবনতির হাত থেকে বেঁচে উন্নতি করতে চাই তেমন আমি যেন কারও উন্নতির পথকে বন্ধ করে না দেই।

২৫। اَلْمُعِزُّ — আল মুয়িযযু ঃ ইজ্জত দানকারী।

২৬। اَلْمُذِلُّ — আল মুজিল্লু ঃ ইজ্জত হরণকারী, অপদস্তকারী।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ যিনি ইজ্জতের মালিক তাঁরই নিকট সদা সর্বদা বলা দরকার যে তিনি যেন বেইজ্জতির হাত থেকে উদ্ধার করেন।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ আমি যেমন নিজে অসম্মানিত হতে চাই না তেমন আমার দ্বারা যেন কেউ অসম্মানিত না হন।

www.pathagar.com

২৭। اَلسَّمِيْعُ — আস সামীয়ু ঃ সব কিছু যিনি শোনেন।

২৮। اَلْبَصِيْرُ — আল বাসীরু ঃ সব কিছু যিনি দেখেন।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণঃ কোন গোপন স্থানেও যেন এমন কিছু না করি যা আল্লাহর দৃষ্টিতে দুষণীয়। কারণ, তাঁর কান ও চোখ এড়ানোর কোন পথ নেই।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীত থাকা।

২৯। اَلْحَكَمُ — আল হাকামু ঃ আল্লাহই আসল হুকুমদাতা ও আসল আইন প্রণেতা।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ আল্লাহকেই প্রকৃত হুকুমকর্তা ও আইনদাতা হিসাবে মেনে নিয়ে জীবন যাপন করা।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ আল্লাহই যেহেতু প্রকৃত আইন প্রণেতা ও হুকুমদাতা কাজেই আমার হুকুম যেন আল্লাহর হুকুমেরই প্রতিধ্বনি হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন, নামায কায়েম কর, আমিও সেই নামায কায়েম করারই হুকুম প্রদান করব এবং তিনি হুকুম করেছেন চোরের হাত কাটতে ও ব্যাভিচারী-ব্যাভিচারিণীকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যাদন্ড দিতে বা ১০০ শত দোর্‌রা মারতে, আমিও যখন রাষ্ট্রপ্রধান হব তখন আমিও আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে ঐ হুকুমই জারি করব যে হুকুম আল্লাহ জারী করেছেন। আল্লাহ বলেছেন ঘুষ চলবে না আমিও বলব ঘুষ চলবে না। আল্লাহ বলেছেন, সুদভিত্তিক নয়; যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। আমি বলব, সুদ ভিত্তিক নয়; যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন মেয়ে পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলবে না, আমিও বলব মেয়ে পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলবে না। এভাবে আল্লাহ হাকাম হিসেবে যা বলেছেন আমিও হাকামের প্রতিনিধি হিসেবে তাই বলব (এর পর থেকে ব্যাখ্যা কিছুটা সংক্ষেপ করব যেন বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি না পায়।)

৩০। اَلْعَدْلُ — আল আদলু ঃ ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায় বিচারক। এই কথা বুঝানোর জন্যেই বলা হয়েছে আল্লাহ "আহকামুল হাকিমীন" বা সর্বোপরি হুকুমদাতা। অতএব আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারও হুকুমই মানব না এবং আদল বা ন্যায় বিচারক আল্লাহর শুকরিয়া সর্বদাই আদায় করব।

www.pathagar.com

৩১। اَللَّطِيْفُ – আল লাতীফু ঃ আল্লাহ বড় সুক্ষ্মদর্শীও বিপদকালে মেহেরবাণী করনেওয়ালা। এর জন্যে প্রয়োজন তার শুকরিয়া আদায় করা ও নিজের মধ্যে বিপদকালে মানুষের উপকার করার মত মনোভাব সৃষ্টি করা।

৩২। اَلْخَبِيْرُ – আল খাবীরু ঃ গোপন খবর রাখনেওয়ালা। কাজেই মনের যাবতীয় গোপন পাপ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।

৩৩। اَلْحَلِيْمُ – আল হালীমু ঃ অতিরিক্ত ধৈর্য্যশীল। কাজেই আমাদেরও অতি ধৈর্য্যশীলের বান্দা হয়ে অতি ধৈর্য্যশীল হতে হবে।

৩৪। اَلْعَظِيْمُ – আল আজীমু ঃ আল্লাহ মহানেরও মহান বা অতি মহান। কাজেই আমরা আল্লাহকে মহান বলে স্বীকার করে নিয়ে সেই মহান আল্লাহর মহান আজ্ঞাবহ দাস হব।।

৩৫। اَلْغَفُوْرُ– আল্ গাফুরু ঃ ক্ষমাশীল আল্ গাফফারু এর সমঅর্থবোধক।

৩৬। اَلشَّكُوْرُ–আশ শাকুরু ঃ যে কাজ যেমন ভাবে করা উচিৎ সে কাজ তেমনি ভাবে করনেওয়ালা এবং মানুষের ছোট কাজের বড় মর্যাদা দেনেওয়ালা।

আমাদেরকেও আল্লাহ যে কাজ যেভাবে করতে বলেছেন যদি সে কাজ সেই ভাবেই করি তাতেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয় আর তার বিপরীত ভাবে কাজ করলে ঐটার নামই হয় জুলুম। কাজেই আমরা যেন জালেম না হয়ে শাকের হই সেজন্যে সর্বদাই হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

৩৭। اَلْعَلِيُّ– আল আলিয়্যু ঃ আল্লাহ অতি বড় মহান।

৩৮। اَلْكَبِيْرُ– আল কাবীরু ঃ আল আজিমু এর প্রায় সম অর্থবোধক শব্দ।

৩৯। اَلْحَفِيْظُ– আল হাফীজু ঃ সারা বিশ্বের সব কিছুই সংরক্ষণ কারী। আল্লাহ যেমন বিশ্বের হেফাজতকারী তেমন আমাদেরও হতে হবে হেফাজতকারী, হুঁশিয়ার থাকতে হবে যেন খেয়ানতকারী না হই।

www.pathagar.com

৪০। اَلْمُقِيْتُ– আল মুকীতু ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান ও সকলেরই রুজিদাতা। কাজেই রুজির জন্যে তাঁরই মুখাপেক্ষী হব এবং তাঁর দেয়া রুজির একটা ভাগ অন্যদেরকেও দেব।

৪১। اَلْحَسِيْبُ– আল হাসীবু ঃ সবার হিসাব গ্রহণকারী। কাজেই নিজেকে সর্বদাই হিসাব করে কাজ করতে হবে যেন হিসাব গ্রহণকারীর হিসাবে দায়ী না হয়ে পড়ি।

৪২। اَلْجَلِيْلُ– আল জালীলু ঃ অতি বড় মর্যাদাশীল।

৪৩। اَلْكَرِيْمُ– আল কারীমু ঃ অতি বড় উদার দয়ালু। কাজেই সেই আল্লাহর উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে এবং তাঁর দয়া ও উদারতার শোকরিয়া আদায় করতে হবে এবং নিজেকেও হতে হবে উদার।

৪৪। اَلرَّقِيْبُ– আর রাকীবু ঃ ভিতর বাহির সব কিছু যিনি দেখেন, শোনেন ও জানেন। কাজেই তাঁর চোখ এড়িয়ে কিছু করার ক্ষমতা নেই কারও। এটা হিসাব করেই চলা উচিত।

৪৫। اَلْمُجِيْبُ– আল মুজীবু ঃ করুণ প্রার্থনা শ্রবণকারী। কাজেই যে কোন অসহায় পরিস্থিতিতে তাঁর নিকট কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করব তিনি তা শুনবেন ও দিবেন।

৪৬। اَلْوَاسِعُ– আল ওয়াসিয়ু ঃ আল্লাহর সব কিছুই অফুরন্ত। কাজেই তাঁর বান্দা হয়ে আমরা অবশ্যই কারও দ্বারস্থ হতে পারি না। দ্বারস্থ হব একমাত্র আল্লাহর। কারণ সব কিছুরই অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে আল্লাহরই নিকট।

৪৭। اَلْحَكِيْمُ– আল হাকীমু ঃ আল্লাহ সর্ববিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী।

৪৮। اَلْوَدُوْدُ– আল ওয়াদুদু ঃ প্রেমময় আল্লাহ। আল্লাহর সঙ্গে যে প্রেম করতে পারে তার প্রেমটাই স্থায়ী আর অন্যান্যদের সঙ্গে যে প্রেম তা ক্ষণস্থায়ী। কাজেই স্থায়ী প্রেমময় আল্লাহর সঙ্গেই আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিৎ।

www.pathagar.com

৪৯। اَلْمَجِيْدُ– আল মাজীদু ঃ আল্লাহই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

৫০। اَلْبَاعِثُ– আল বায়িছু ঃ কিয়ামতের দিনে পুনরুত্থানকারী।

৫১। اَلشَّهِيْدُ– আশ শাহীদু ঃ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্যদাতা।

৫২। اَلْحَقُّ– আল হাক্কু ঃ আল্লাহই মহাসত্য।

৫৩। اَلْوَكِيْلُ– আল ওয়াকীলু ঃ আল্লাহই সকল প্রকার কার্য সম্পন্নকারী।

৫৪। اَلْقَوِىُّ– আল কাবীয়্যু ঃ মহা শক্তিশালী। আল্লাহ অটুট, আল্লাহই শক্তিশালী।

৫৫। اَلْوَلِىُّ– আল ওয়ালিয়্যু ঃ আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী বন্ধু।

৫৬। اَلْحَمِيْدُ– আল হামিদু ঃ আল্লাহই প্রকৃত প্রশংসার উপযুক্ত।

৫৭। اَلْمُحْصِىُّ– আল মুহসিয়্যু ঃ মানুষের জাহের বাতেন যাবতীয় কথা, কাজ ও খেয়ালকে হিসাবের জন্যে গুণে গুণে হেফাজতকারী।

৫৮। اَلْمُبْدِئُ– আল মুবদীউ ঃ সকলের প্রথম সৃষ্টিকর্তা।

৫৯। اَلْمُعِيْدُ– আল মুয়ীদু ঃ আখেরাতের জীবনের জন্য সকলকে পুনরায় সৃষ্টিকর্তা।

৬০। اَلْمُحْيِىُ– আল মুহয়ী ঃ আল্লাহ জীবন ও হায়াতদাতা।

৬১। اَلْمُمِيْتُ– আল মুমীতু ঃ আল্লাহ মৃত্যুদাতা।

৬২। اَلْحَىُّ– আল হাইয়ু ঃ চিরঞ্জীব।

৬৩। اَلْقَيُّوْمُ– আল কাইয়ুমু ঃ চির প্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

৬৪। اَلْوَاجِدُ– আল ওয়াজিদু ঃ প্রকৃত ধনী

৬৫। اَلْمَاجِدُ– আল মাজীদু ঃ প্রকৃত সম্মানী।

৬৬। اَلْوَاحِدُ– আল ওয়াহিদু ঃ আল্লাহ এক, একক সত্ত্বা

৬৭। اَلصَّمَدُ– আস সামাদু ঃ অভাব ও দোষত্রুটি মুক্ত এবং যার সিদ্ধান্ত কেউ রদবদল করতে পারে না। আল্লাহ 'সামাদ' বলেই নিম্নোক্ত ফরিয়াদগুলি আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়। যেমনঃ—

ইয়া কাদিয়াল হাজাত — হে অভাব মোচনকারী।

ইয়া কাফিয়াল মুহিম্মাত — হে সমস্যার সমাধানকারী।

ইয়া হাল্লালাল মুশকীলাত — হে মুশকিল আসানকারী।

ইয়া দাফিয়াল বালিইয়াত — হে বিপদ আপদ দূরকারী।

ইয়া শাফিয়াল আমরাদ — হে রোগ মুক্তিকারী।

ইয়া মুছাব্বিবুল আসবাব — হে উপায় উপকরণ সৃষ্টিকারী।

ইয়া রাফিয়াদ্দারাজাত — হে সম্পদ ও মর্যাদা দানকারী, ইত্যাদি নামে আল্লাহকে যে ডাকা হয় তার কারণ এসব কিছু দেওয়ার মত গুণ ও ক্ষমতা যার মধ্যে থাকে তিনিই যেহেতু 'সামাদ' তাই সামাদের নিকটই ওসব চওয়া হয়।

৬৮। اَلْقَادِرُ– আল কাদিরু ঃ শক্তিমান।

৬৯। اَلْمُقْتَدِرُ– আল মুক্তাদিরু ঃ সর্বশক্তিমান দুইটাই সম অর্থবোধক শব্দ।

৭০। اَلْمُقَدِّمُ– আল মুকাদ্দিমু ঃ অগ্রগামী করনেওয়ালা।

৭১। اَلْمُؤَخِّرُ– আল মুয়াখখিরু ঃ পশ্চাতগামী করনেওয়ালা।

৭২। اَلْاَوَّلُ– আল আউয়ালু ঃ আল্লাহই আদি।

www.pathagar.com

৭৩। اَلْاٰخِرُ– আল আখিরু ঃ আল্লাহই শেষ বা অন্ত।

৭৪। اَلظَّاهِرُ– আজ জাহিরু ঃ তিনিই প্রকাশ্য বিষয় জানেন।

৭৫। اَلْبَاطِنُ– আল বাতিনু ঃ তিনিই গোপন বিষয় জানেন।

৭৬। اَلْوَالِىْ– আল ওয়ালি ঃ তিনিই প্রথম অধিকার বিস্তারকারী বাদশাহ।

৭৭। اَلْمُتَعَالِىْ– আল মুতায়ালী ঃ সর্বোপরি ক্ষমতাশালী।

৭৮। اَلْبَرُّ– আল বাররু ঃ তিনিই পরম উপকারী বন্ধু।

৭৯। اَلتَّوَّابُ– আত তাউয়াবু ঃ তিনিই তওবার তৌফিক দানকারী ও তওবা কবুলকারী।

৮০। اَلْمُنْتَقِمُ– আল মুনতাকিমু ঃ তিনিই শাস্তিদানকারী।

৮১। اَلْعَفُوُّ– আল আফুব্বু ঃ আল্লাহ ক্ষমাকারী।

৮২। اَلرَّءُوْفُ– আর রাউফু ঃ তিনিই অতিশয় সদয়।

৮৩। مَالِكُ الْمُلْكِ– মালিকুল মুলকি ঃ সমস্ত বিশ্ব জাহানের রাজা। তিনি পৃথিবীরও রাজা আকাশেরও রাজা।

৮৪। ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ– জুলজালালি ওয়াল ইকরামঃ তিনিই সমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক।

৮৫। اَلْمُقْسِطُ– আল মুকসিতু ঃ তিনিই ন্যায় বিচারক।

৮৬। اَلْجَامِعُ– আল জামিয়ু' ঃ হাশরে তিনিই সবাইকে সমবেতকারী।

৮৭। اَلْغَنِىُّ– আল গানিয়্যু ঃ তিনিই প্রকৃত ধনী।

www.pathagar.com

৮৮। اَلْمُغْنِى– আল মুগনি ঃ তিনি ধনী করনেওয়ালা।

৮৯। اَلْمَانِعُ– আল মানিয়ু ঃ তিনি ধনী না করলে কেউ ধনী হতে পারে না এবং তিনি ধনী করলে কেউ রদ করতে পারে না।

৯০। اَلضَّارُّ– আদ দাররু ঃ অনিষ্টের মালিক আল্লাহ।

৯১। اَلنَّافِعُ– আন নাফিয়ু ঃ উপকারের মালিকও আল্লাহ।

৯২। اَلنُّوْرُ–আন্ নূরু ঃ তিনিই আলো ও আলোর মালিক।

৯৩। اَلْهَادِى– আল হাদি ঃ তিনিই হেদায়েতের মালিক।

৯৪। اَلْبَدِيْعُ– আল বাদিয়ু ঃ বিনা উপাদানে সবকিছুর প্রথম অস্তিত্বদাতা ও সৃষ্টিকর্তা।

৯৫। اَلْبَاقِى– আল বাকি ঃ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর শুধু তিনিই বাকি থাকবেন।

৯৬। اَلْوَارِثُ– আল ওয়ারিছু ঃ সকলের সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন আল্লাহ।

৯৭। اَلرَّشِيْدُ– আর রাশীদু ঃ আল্লাহই সর্বদা সর্বক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্যের উপর রয়েছেন।

৯৮। اَلصَّبُوْرُ– আছ ছাবূরু ঃ আল্লাহ অসীম ধৈর্য্যশীল।

৯৯। اَلسَّتَّارُ– আস সাত্তারু ঃ আল্লাহ মানুষের দোষ গোপনকারী। তিনি যদি প্রত্যেকটি মানুষের যাবতীয় দোষ ত্রুটি জাহির করে দিতেন তাহলে দুনিয়ার একটি মানুষও লজ্জায় বাইরে বের হতে পারত না।

উপরে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের ১টি যা-তি নাম ও ৯৯টি সিফাতী বা গুণবাচক নামের মধ্যে আল্লাহর যে গুণের পরিচয় পাওয়া গেল সেই পরিচয়

www.pathagar.com

সহকারে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে এবং আল্লাহর গুণের প্রতিচ্ছায়া ঘটাতে হবে নিজের চরিত্রের মধ্যে। অর্থাৎ আল্লাহ রহমান হিসাবে যত দয়ালু তত দয়ালু তো আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ হয়ে হওয়া যাবে না ঠিকই কিন্তু মানুষ যতটুকু দয়ালু সাধারণতঃ হতে পারে আমাকে ততটুকু দয়ালু হতে হবে। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ তার বিরুদ্ধবাদীদের যাবতীয় কুকর্ম দেখছেন অথচ তাদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে দিচ্ছেন না। চরমভাবে ছবর করে যাচ্ছেন। আমরা তত ছবরকারী হতে পারব না ঠিকই কিন্তু মানুষের জন্যে যতটুকু সম্ভব ততটুকু ছাবের বা ধৈর্যশীল হতে হবে। এভাবে আল্লাহর প্রত্যেকটি সিফাতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক যেমন দৃঢ় করতে হবে তেমন চরিত্রের মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তবেই 'কামা হুয়া বি আসমায়িহি ওয়া সিফাতিহি' কথার হক আদায় করে উক্ত কথার প্রতি ঈমান আনা হয়। নইলে শুধু তোতা পাখির মত পড়লেই ঈমান হয় না। অতঃপর "কাবিলতু জামিয়া আহকামিহি ওয়া আরকানিহি" কথার মাধ্যমে বলা হয় যে আল্লাহর যাবতীয় আইন কানূন ও বিধি বিধান কবুল করে নিলাম। এবার চিন্তা করুন কার আইন কানূন মেনে নেওয়ার কথা স্বীকার করা হচ্ছে। যার ১টি যা-তি নাম ও ৯৯টি সিফাতি নামের মধ্যে যাকে স্বীকার করে নিয়েছি—তারই যাবতীয় আইন কানূন মেনে নেওয়ার স্বীকারোক্তি হচ্ছে কাবিলতু শব্দের মধ্যে।

'কাবিলতু' শব্দের তাৎপর্য

এটাকে সহজ করে বুঝাবার জন্যে একটি বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি। দেখুন 'কাবিলতু' শব্দটা আরবী শব্দ হলেও আমরা বিবাহিত ও বিবাহিতা মুসলমানরা সবাই এ শব্দটার সঙ্গে পরিচিত। বিবাহের সময় এই কাবিলতু শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেই অথবা তার অনুরূপ অর্থবোধক শব্দ হ্যাঁ বা হু শব্দ দ্বারা একজন স্ত্রী একজন পুরুষকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে নেয়, ঠিক তদ্রূপ একজন পুরুষও এই একই শব্দ দ্বারা একজন মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। এই শব্দটা মাত্র একবারই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে। আর তার প্রতিক্রিয়া জারী থাকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ একবার মাত্র 'কাবিলতু' বলার কারণে একটা মেয়ের জীবন যাপনের গতিধারা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে যায়। যে মেয়েটা 'কাবিলতু' বলার পূর্ব পর্যন্ত ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু 'কাবিলতু' বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ পরাধীন। যাকে স্বামী বলে স্বীকার করে নেয় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে আর

www.pathagar.com

কিছুই করার অধিকার রাখে না। ঠিক তেমনই একটা মানুষ আল্লাহকে যখন বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার সমস্ত আইন কানূন (কাবিলতু) গ্রহণ করলাম। তখন তারও জীবন যাপনের যাবতীয় গতিধারা ও কার্যকলাপ 'কাবিলতু' কথার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে হবে। নইলে 'কাবিলতু' শব্দ দ্বারা যা স্বীকার করা হয় তা বাস্তবে মানা হয় না। একটা মেয়ে যেমন একজন পুরুষকে স্বামী হিসাবে 'কাবিলতু' বলে স্বীকার করে নেয়ার পর আর কারও স্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে পারেনা তেমন একজন মানুষ আল্লাহর যাবতীয় আইন কানূন 'কাবিলতু' বলে মেনে নেয়ার পর আর কারও আইনই মেনে নিতে পারে না।

এখানে মনে রাখতে হবে আল্লাহর আইন মানার অর্থ শুধু নামায, রোজা ও দাড়ী টুপির আইন মানাই নয়; বরং আল্লাহর আইন বলতে বুঝাবে আল কুরআন ও আল হাদিসের মাধ্যমে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) যত কথা বলেছেন এবং যত প্রকার হুকুম আহকাম জারী করেছেন তার প্রত্যেকটি আইন স্বীকার করা এবং তা বাস্তব জীবনে পুংখানুপুংখ রূপে পালন করা। এরই নাম হচ্ছে সত্যিকার অর্থে 'কাবিলতু' বা মেনে নিলাম। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা ব্যক্তি জীবনেই হোক বা রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক জীবনেই হোক অথবা ব্যবসা বাণিজ্য যুদ্ধ, সন্ধি চুক্তি, লেখাপড়া, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, যা-ই হোক না কেন তার সবই আল্লাহর বিধান মুতাবিক যদি পালন করা হয় তবেই আল্লাহকে কাবিলতু বাক্য অনুযায়ী স্বীকার করা হয়, তা বাস্তবেও মানা হয়। নইলে মুখে আল্লাহকে বললাম আল্লাহ তোমার যাবতীয় হুকুম অহকাম 'কাবিলতু' বা মেনে নিলাম আর বাস্তবে যদি অফিস আদালতে, কল কারখানায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে, ব্যবসা বানিজ্যে সমস্ত ব্যাপারেই আল্লাহর আইন মেনে চলতে না পারি তবে ঈমানে মুজমালের স্বীকারোক্তির প্রকৃত হক আদায় হয় না। কাজেই সকল ক্ষেত্রেই এ ধরনের মানার নামই সত্যিকার ঈমান আনা। অন্যথায় মুখে এক প্রকার স্বীকার করে কাজে তার বিপরীত কিছু করলে আল্লাহর সঙ্গে ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই হয় না।

www.pathagar.com

ঈমানের বৈশিষ্ট্য

"ইন্নাল মু'মিনুনাল্লাযিনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ছুম্মা লাম ইয়ারতাবু ওয়া-জাহাদু বি-আমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম ফি সাবিলিল্লাহি উলায়িকা হুমুচ্ছাদিকুন।" (২৬ পারা, সূরা হুজুরাত, ১৫ আয়াত) অবশ্য ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে পরে মনে আর কোন সন্দেহ পোষণ করে নি এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর রাস্তায় মাল দিয়ে ও জান দিয়ে— তাদেরই ঈমানের দাবী সত্য।

মক্কা বিজয়ের পর যখন গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকগুলি এসে নবী (স) এর নিকট বলতে লাগল যে, হুজুর আমরা ঈমান এনেছি তখন আল্লাহ পাক অহি নাযিল করে বললেন যে তুমি ওদের বলে দাও "তোমরা ঈমান আন নি বরং তোমরা বলতে পার যে আমরা ইসলামকে মেনে নিয়েছি বা গ্রহণ করেছি।" তার পরপরই আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন এবং এর মাধ্যমে ঈমানের ২টি বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করলেন। পূর্বের এ আয়াত শরিফের মাধ্যমে ঈমানের ২টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। যথা —

(১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসটা হতে হবে নিঃসন্দেহ ও নিঃসংশয়।

(২) আল্লাহ বিশ্বাসের বিপরীত কোন কিছু দেখলে তা সমাজ থেকে উৎখাত করে সেখানে খোদায়ী ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে মাল ও জান দিয়ে জিহাদে লিপ্ত হয়ে যেতে হবে।

অতঃপর যাদেরই বাস্তব কার্যকলাপের মাধ্যমে উক্ত বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে, আল্লাহ বলেন,তাদেরই ঈমানের দাবী সত্য।

ব্যাখ্যা ঃ সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থও দুটি ঃ যথা—

(১) এ বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা যে এক আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তিনিই যে একমাত্র সর্বময় ক্ষমতা, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, আইন তৈরী ও হুকুম দেয়ার মালিক এবং তিনিই যে যুগে যুগে তাঁর বান্দাদেরকে ভুল পথ থেকে উদ্ধার করে সঠিক পথে চালানোর উদ্দেশ্যে নবী পাঠিয়েছেন এতে মনে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ না করা।

www.pathagar.com

(২) ইহকাল ও পরকালের জীবনে শান্তি আসতে পারে যে রাস্তায় চললে, সে রাস্তার সন্ধান যে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথই যে একমাত্র কল্যাণকর পথ এবং তাঁর বিপরীত পথই ধ্বংসের পথ তা নিঃসন্দেহে ও নিঃসংশয়ে মেনে নেয়া। অতঃপর যাঁরাই তা মেনে নেন তাঁদেরই মনের অবস্থা হয় এমন যে, তাঁরা যখন যে সমাজে বাস করেন সেই সমাজের সমাজ ব্যবস্থা যদি এমন হয় যে তাঁরা (ঈমানদার ব্যক্তিগণ) যে ব্যবস্থাকে কল্যাণকর বা পরিত্রাণের রাস্তা বলে বিশ্বাস করেন সেটা তার বিপরীত ব্যবস্থা তাহলে তাঁরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবেন এই চিন্তায় যে, সমাজ আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে বা জাহান্নামের দিকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় প্রচলিত সমাজব্যবস্থা যে ব্যবস্থাকে ঈমানদার ব্যক্তিগণ জাহান্নামের রাস্তা বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন সেই সমাজ ব্যবস্থাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন? এর সহজ সরল জবাব হচ্ছে এই যে, একজন শান্তিকামী স্বাধীন মানুষ যখন তাঁর প্রাণ হরণকারী কোন শত্রুর হাতে বন্দী হয় তখন সেই শান্তিকামী স্বাধীন মানুষটি তাঁর ঐ শত্রুটিকে যেমন ভাবে গ্রহণ করবে ঠিক তেমনভাবেই গ্রহণ করবে একজন ঈমানদার ব্যক্তি তাঁর ঈমান বিরোধী সমাজ ব্যবস্থাকে। অর্থাৎ ঐ বন্দী ব্যক্তি যেমন বোঝে যে তাঁর শত্রু তাকে বধ করার জন্যেই বন্দী করেছে ঠিক তেমনভাবেই একজন ঈমানদার লোকও বুঝবে যে বর্তমান প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা যা কুরআন হাদীস মুতাবিক নয় তা (সেই সমাজ ব্যবস্থা) ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই তৈরী হয়েছে।

এ অবস্থায় একজন ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে? এর সহজ সরল জবাব হচ্ছে এই যে, ঐ বন্দী ব্যক্তির মন তাকে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্যে জোর তাগিদ দিবে একজন ঈমানদার ব্যক্তিরও সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে যখন সে তাঁর ঈমান বিরোধী সমাজে বাস করবে। অর্থাৎ বন্দী ব্যক্তি যদি বোঝে যে চরম চেষ্টা ও চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে অবশ্যই সে ব্যক্তি চরম চেষ্টা ও চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবেই। ঠিক তদ্রূপ একজন ঈমানদার ব্যক্তি যদি বোঝেন যে তাঁকেও ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্যে চরম চেষ্টা ও চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে, যে সমাজ ব্যবস্থার অধীন চললে পরকালে বেহেশত মিলবে, দুনিয়াতেও শান্তি মিলবে তখন সে ঈমানদার ব্যক্তিও খোদায়ী আইনের সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্যে চরম

www.pathagar.com

চেষ্টা ও চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। এ চেষ্টার জন্যে প্রথম প্রয়োজন হবে মালের, পরে প্রয়োজন হবে জানের। সে জন্যেই আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ মানুষ যখন সন্দেহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে নেয় তখন তাদের বিশ্বাসের বিপরীত ব্যবস্থা সমাজে দেখলেই তারা "জাহাদু বি আমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম ফি সাবিলিল্লাহি"— জেহাদ করে মাল দিয়ে ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায়।

অতঃপর শত্রুর হাতে বন্দী ব্যক্তি যদি নিজেকে তার হাত থেকে উদ্ধারের জন্যে চেষ্টা না করে তাহলে বুঝতে হবে হয়ত সে শত্রুকে শত্রু হিসাবে মনে করে না বরং তাকে বন্ধুই মনে করে নইলে মনে করতে হবে বন্দী ব্যক্তির কোন বোধ শক্তি নেই। তাহলে এ অবস্থায় ১ম ব্যক্তি তো নিজেকে বন্দীই মনে করে না আর ২য় ব্যক্তির যেহেতু কোন বোধ নাই কাজেই তার মনে করা না করা উভয়ই সমান। এই দুই শ্রেণীর লোক যদিও প্রকৃতপক্ষে বন্দী তবুও তারা যে বন্দী সে বিশ্বাস তাদের নেই কাজেই জিহাদ করে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হবে এ চেষ্টাও তাদের থাকবে না। কিন্তু যারা নিজেদেরকে বন্দী হিসেবে মনে করে তারা অবশ্যই বন্দী অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে জিহাদ বা চরম চেষ্টা করবেই। অর্থাৎ ঈমান বিরোধী সমাজ ব্যবস্থা যা মানুষকে জাহান্নামের দিকে টেনে নেয় তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে যারাই জিহাদে লিপ্ত হয় তাদের কথাই আল্লাহ বলেছেন— "উলায়িকা হুমুচ্ছাদিকুন" তাদেরই ঈমানের দাবী সত্য।

কাদের ঈমানের দাবী সত্য ?

একটি পরীক্ষা

আমাদের মধ্যে ২টা জিনিস রয়েছে ; যথা— (১) দেহ (২) রুহ বা জীবন। এর মধ্যে প্রথমটা বস্তু আর দ্বিতীয়টা অবস্তু। দেহের সব কিছুই দেখা যায় আর রুহ এবং রুহের সঙ্গে যে সব শক্তি রয়েছে তার কিছুই দেখা যায় না। যেমন পুরা দেহটাকেই দেখা যায় কিন্তু রুহ এবং তার সঙ্গে যা রয়েছে অর্থাৎ তার অনুভূতি, বিবেক বুদ্ধি, দৃষ্টি শক্তি, শ্রবনশক্তি, হিংসা, দ্বেষ, রাগ, ভালবাসা ইত্যাদি এর প্রত্যেকটিই রয়েছে কিন্তু তা দেখা যায় না। মৃত্যুর পর মানুষের দেহ, যা দেখা

www.pathagar.com

যায়, তা ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে যাবে আর যা দেখা যায় না যে গুলো রুহের সঙ্গে রয়েছে— মৃত্যুর পর তার সবকিছুই থাকবে। কিন্তু তা থাকবে বাহন ছাড়াই। এখন আমাদের যে দেহ, এটা হচ্ছে রুহের বাহন মাত্র। একটা মানুষ কোন গাড়ীতে করে ভ্রমন করার সময় সে যেহেতু গাড়ীর মধ্যে থাকে তাই গাড়ী থামলে সে থামে, গাড়ী চললে সে চলে, গাড়ী এক্সিডেন্ট করলে সে এক্সিডেন্ট করে; ঠিক তেমনি মানুষের আসল রুহ যতদিন পর্যন্ত তার দেহ বাহনের মধ্যে রয়েছে ততদিন দেহের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু গাড়ীর যাত্রী যেমন গাড়ী থেকে নেমে গেলে আর গাড়ীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না ঠিক তদ্রুপই মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহের সঙ্গে তার রুহের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং কোন যাত্রীর যেমন গাড়ীর ভিতরে থাকা কালেও তার যে অনুভূতি ও সেই জ্ঞানবুদ্ধি থাকে অনুরূপভাবে কোন দূর বিদেশের যাত্রী যেমন বিমানে করে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে গিয়ে অবতরণ করে যেমন বুঝে যে— আমি ঠিক যে মানুষটা বাংলাদেশে ছিলাম ঐ মানুষটাই এই সৌদি আরবেও রয়েছি, তবে পার্তক্য এতটুকু যে পূর্বে যে দেশে ছিলাম সেখানের লোকের সঙ্গে বাংলাভাষায় কথা বলা যেত কিন্তু এখানে এসে আরবীতে কথা বলা লাগছে। ঠিক তেমনই মৃত্যুর পর সে দেখবে যে দুনিয়ার জীবনে যে যেমন বাংলায় কথা বলতো এখন পরপারের জীবনে তা বলা যাচ্ছে না। আর সৌদি আরবে গেলে যেমন প্রায় সবই অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত হয় ঠিক তেমনি মৃত্যুর পরপারের জীবনে পৌঁছে গেলেও প্রায়ই অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত হবে এ উদাহরণ হচ্ছে পৃথিবীর জীবনকে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে পরকালের জীবনকে বুঝানোর চেষ্টা মাত্র। উদাহরণ যদিও খুবই কাছা কাছি তবুও যেহেতু জীবনের সেটা (মৃত্যুর পরপারের) ভিন্ন স্তরের ঘটনা তাই, একেবারেই হুবহু উদাহরণ, তা বলা চলেনা, তবে উদাহরণটা যে খুবই কাছাকাছি এতে কোন সন্দেহ নেই। এইটাই হচ্ছে আমাদের এ জীবনের বাস্তব অবস্থা। এখন জীবনের এই অবস্থাকে সামনে রেখে যদি প্রশ্ন করা যায় যে—

১। দেহের জীবনকাল দীর্ঘদিনের না রুহের জীবনকাল? এর জবাবে প্রত্যেকটি মুসলমান বলবে যে, রুহের জীবনকাল শুধু দীর্ঘস্থায়ী নয় বরং রুহ হচ্ছে অনন্তকালের জন্যে আর দেহ হচ্ছে একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। এরপর যদি প্রশ্ন করা যায়—

www.pathagar.com

২। মানুষ, যারা ঈমানের দাবীদার তারা তো অবশ্যই বিশ্বাস রাখেন যে পরকালের জীবনের কোন শেষ নাই আর দুনিয়ার জীবন সম্পূর্ণই ক্ষণস্থায়ী আর সঙ্গে সঙ্গে তারা একথাও জানেন ও স্বীকার করেন যে এ-দুনিয়ায় যত কাজ করি তার কিছু করি অস্থায়ী দেহের সুখ শান্তির জন্যে আর কিছু করি স্থায়ী রূহের জন্যে অর্থাৎ পরকালের জীবনের সুখ শান্তির জন্যে কিন্তু আমরা কি দেহের বা দুনিয়ার জীবনের সুখ শান্তির উদ্দেশ্যে বেশী মেহনত করি নাকি রূহের বা পরকালের জীবনের সুখ শান্তির জন্যে বেশী মেহনত করি এবং আমরা কি ক্ষণ স্থায়ী জীবনের শান্তির জন্যে বেশী চিন্তা ভাবনা করি নাকি স্থায়ী জীবনের সুখ শান্তির জন্যে বেশী চিন্তা ভাবনা করি? এর জবাবে প্রায় প্রত্যেকেই বলবে আমরা দুনিয়ার সুখ শান্তির জন্যেই বেশী মেহনত করি এবং বেশী চিন্তা ভাবনাও করি। এবার যদি জিজ্ঞাসা করি যে এইটাই কি পরকালে বিশ্বাসের লক্ষণ , তাহলে একটা বদ্ধ পাগলও বলবে যে এটা অবশ্যই পরকাল বিশ্বাসের কোন লক্ষণ নয়।

যেখানে আল্লাহর কথা— "অজীয়া ইয়াওমায়িজীম বি জাহান্নাম" এর ব্যাখ্যায় লেখা রয়েছে যে পরকালের বিচার দিনের ভয়াবহতা দেখে মানুষ এমনভাবে ভয়ে শিউরে উঠবে যে যারা নবী রাসূল (স) যারা পরিষ্কার বুঝবেন যে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, তারাও শিউরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গায়ের পশমগুলি ঝরে পড়ে যাবে। এতবড় ভয়াবহ বিচার দিন যাদের সামনে রয়েছে, আর তা যারা সত্যই বিশ্বাস করে তারা কি সেই আল্লাহর হুকুম কাটায় কাটায় না মেনে পারে? আর তারা যখন বোঝে যে সমাজে যে ধরনের আল্লাহ বিরোধী কার্যকলাপ রয়েছে তা মেনে চললে পরকালে উদ্ধার পাওয়া যাবে না তখন তাদের ঈমানের দাবীতেই তারা খোদায়ী জীবন ব্যবস্থা সমাজে কায়েম করার উদ্দেশ্যে জিহাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এটাই হবে তাদের ঈমানের লক্ষণ। এ জন্যেই আল্লাহ বলেছেন— যারা সত্যিই বিশ্বাসী তারা অবশ্যই "জাহাদু বি আমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম ফি সাবিলিল্লাহি' (খোদায়ী খেলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যে) জিহাদ করে মাল দিয়ে ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায়। আল্লাহর রাস্তায় কথার ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহর আইন বা খোদায়ী খেলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যে, এই কথাকেই সংক্ষেপে বলা হয়েছে 'ফি সবিলিল্লাহি' বা আল্লাহর রাস্তায়। আর এ কাজ যারা করে তাদেরই কথা বলা হয়েছে 'উলায়িকা হুমুচ্ছাদিকূন' বা তাদের ঈমানের দাবী সত্য; অন্যান্যদের দাবী সত্য নয়।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

আল্ কুরআনের কোথায় কতবার আল্লাহর উলুহিয়াত বা সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হল।

اِلٰهٌ– **ইলাহ** (৮০বার) আল বাকারা ঃ ১৩৩, ১৬২, ১৬৩, ২৫৫। আলে ইমরান ঃ ২, ৬, ১৭ , ১৮, ৬২। আন নিসা ঃ ৮৭, ১৭১। আল মায়িদাঃ ৮৩, ৮৩। আল আনয়াম ঃ ১৯, ৪৬, ১০২, ১০৬। আল আ'রাফ ঃ ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫, ১৫৮। আত তাওবা ঃ ৩১, ১২৯। ইউনুস ৯০। হুদ ঃ ১৪, ৫০, ৬১, ৮৪। রা'দ ঃ ৩০। ইব্রাহিম ঃ ৫২। আন্ নাহাল ঃ ২, ২২, ৫১। আল কাহাফ ঃ ১১০। ত্বাহা ৮, ১৪, ৮৮, ৯৮। আল আম্বিয়া ঃ ২৫, ২৯, ৮৭, ১০৮। আল হাজ্জ ঃ ৩৪। আল মু'মিনুন ঃ ২৩, ৩২, ৯১, ৯১, ১০৬। আন নামাল ঃ ২৬, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪। আল কাছাছ ঃ ৩৮, ৩৮, ৭০, ৭১, ৭২, ৮৮। আল ফাতির ঃ ৩। আস্ সাফফাত ঃ ৩৫। দ-দ্ ঃ ৬৫। জুমারঃ ৬। মু'মিনঃ ৩, ৩৭, ৬২, ৬৫। হামিম-আস্ সিজদাঃ ৬। যুখরুফ ৮৪, ৮৪। আদ্ দুখানঃ ৮। মোহাম্মাদ ঃ ১৯। আত্ তুর ঃ ৪৩। আল্ হাশার ঃ ২২, ২৩। আত্ তাগাবুন ঃ ১৩। আল মুজ্জাম্মিল ঃ ৯। আন্ নাস্ ঃ ৩।

اِلٰهًا– **ইলাহান** (১৬ বার) আল বাকারা ঃ ১৩৩। আল্ আ'রাফঃ ১৩৮, ১৪০। আত্ তাওবা ঃ ৩১ঃ আল হিজির ঃ ৯৬। বনি ইসরাইল ঃ ২২, ৩৯। আল কাহাফ ঃ ১৪। আল মু'মিনুন ঃ ১১৭ । আল ফুরকান ঃ ৬৮ । আশ শু'য়ারা ঃ ২৯, ২১৩। আল কাছাছ ঃ ৮৮। দোয়াদ ৫। ক্বাফ ঃ ২৬। জারিয়াহ ঃ ৫১।

اِلٰهَكَ– **ইলাহাকা** (২ বার) বাকারা ঃ ১১৩। তোয়াহা ৯০ ।

اِلٰهَكُمْ–**ইলাহাকুম** (১০বার) বাকারা ঃ ১৬৩। নাহাল ঃ ২২ । কাহাফ ঃ ১১০। তোয়াহা ঃ ৮৮, ৯৮। আম্বিয়া ঃ ১০৮। আল্ হাজ্জ্ ঃ ৩৪। আল আনকাবুত ঃ ৪৬। আস্ সাফফাতঃ ৪। হা-মিম্ আস্ সাজদা ঃ ৬।

اِلٰهُنَا– **ইলাহুনা** (১বার) আনকাবুত ঃ ৪৬

www.pathagar.com

اِلٰهَةٌ– **ইলাহাতুন** (২বার) ফুরকান ঃ ৪৩ । আল্ জাসিয়াঃ ২৩ ।

اِلٰهَةٍ– **ইলাহাতিন** (১৮ বার) মায়েদা ঃ ১১৬। নাহাল ঃ ৫১। আনয়াম ঃ ১৯, ৭৪। আ'রাফঃ ১৩৮। বানি ইসরাইল ঃ ৪২। কাহাফঃ ১৫। মারিয়ামঃ ৮১। আম্বিয়া ঃ ২১, ২২, ২৪, ৪৩, ৯১। ফোরকান ঃ ৩। ইয়াসিন ঃ ২৩, ৭৪। আস্ সাফফাত ঃ ৮৬। ছোয়াদ ঃ ৫। যুখরুফ ঃ ৪৫। আহ্কাফ ঃ ২৮।

اِلٰهَتِكَ– **ইলাহাতিকা** (১বার) আ'রাফ ঃ ১২৭।

اِلٰهَتِكُمْ– **ইলাহাতিকুম** (৪বার) আম্বিয়া ঃ ৩৬, ৬৮। দোয়াদ ঃ ৬। নূহ ঃ ২৩।

اِلٰهَتِنَا– **ইলাহাতিনা** (৮ বার) হুদ ঃ ৫৩, ৫৪। আম্বিয়া ঃ ৫৯,৬২। ফুরকানঃ ৪২। আস্ সাফফাত ঃ ৩৬। যুখরুফ ঃ ৫৮। ওয়াকাফঃ ২২।

اِلٰهَتُكُمْ– **ইলাহাতুকুম** (২ বার) হুদ ঃ ১০১। আস্ সাফফাতঃ ৯১।

اِلٰهَتِىْ– **ইলাহাতী** (১ বার) মারিয়াম ঃ ৪৬।

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের প্রণীত আমাদের প্রকাশিত

দারসে কুরআন সিরিজ

১। সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা	২০.০০
২। আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য	১০.০০
৩। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা	১৫.০০
৪। প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী	১২.০০
৫। কুরবাণীর শিক্ষা	১০.০০
৬। ঈমানের দাবী ও মুমিনের পরিচয়	১৫.০০
৭। কেসাস অসিয়াত ও রোযা	১০.০০
৮। অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা	১০.০০
৯। ইসলামী দণ্ডবিধি	১০.০০
১০। মিরাজের তাৎপর্য	২০.০০
১১। পর্দার গুরুত্ব	২০.০০
১২। বান্দার হক (হুকুকুল ইবাদ)	১২.০০
১৩। ইসলামী জীবন দর্শন	১৫.০০
১৪। মহাশূন্যে সবই ঘুরছে	২০.০০
১৫। নাজাতের সঠিক পথ	১৫.০০
১৬। ইসলামে রাজদণ্ড	১০.০০
১৭। যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব	৬০.০০
১৮। রাসূলুল্লাহর বিদায়ী ভাষণ	১৫.০০
১৯। সূরা ইখলাসের হাকীকত	১৫.০০

সিরিজ বর্হিভূত বই-

০ সওয়াল জওয়াব ৪খণ্ড একত্রে (বোর্ড বাধাই)	৯০.০০
০ দারসুল কোরআন-১ম	৭০.০০
০ কালেমার হাকীকত	৩৫.০০
০ বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান	২০.০০
০ কবরের সওয়াল জওয়াব	১৫.০০
০ অমুসলিমদের প্রতিমহাসত্যের ডাক	২০.০০
০ স্মারক পত্র	৬.০০
০ বাংলাদেশে দ্বীন ইসলাম মুকীম না মুসাফির	৬.০০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫